فتاوى السياسة الشرعية

ইসলামী রাজনীতি বিষয়ক ফতোয়া

شيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله

শাইখ মুক্ববিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আনসারী

দাওরাতুল হাদীস, জামেয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা

مُراجعة :عبد العليم بن كوثر

সম্পাদনায়: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

www.maktabatussunnah.org

email: maktabatussunnah19@gmail.com

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০২৩ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ১০০ (একশত) টাকা

সূচিপত্র

ইসলামী রাজনীতি বিষয়ক ফতোয়া

সম্পাদকের কথা

পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম 'ইসলাম'। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য দীন হিসাবে ইসলামকে পছন্দ করলাম' (সূরা আল-মায়েদাহ, ৫:৩)।

কেবল ইসলাম ধর্মেই মানব জীবনের সবদিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইহকাল-পরকালে একজন ব্যক্তির সুখের জন্য যা কিছু লাগে, তার সবই ইসলামে বিদ্যমান। পৃথিবী আবাদ করার জন্য যা কিছু দরকার, তার সবটাই ইসলামে রয়েছে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র শুধু নয়; এমনকি গোটা পৃথিবী পরিচালনার সবদিক ও বিভাগও ইসলামে মওজূদ রয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ, শিক্ষা-সংস্কৃতি সবকিছুকেই ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে এবং এসবের সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী নীতি প্রণয়ন করেছে। ইসলাম কখনই শুধু এমন বাহ্যিক কিছু আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়, যার সাথে মানুষের বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই।

আর রাজনীতি? সে তো ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম শাসকগণ সারা দুনিয়া শাসন করেছেন। কিভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে হয়, তা তারা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সমরনীতি সব নীতিই তারা সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করে গেছেন। এমনকি বনী ইসরাঈলের নাবী-রাসূলগণও তাদের জনগণের উপর রাজনীতির বাস্তব প্রয়োগ করেছেন। আর আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম বিষয়টিকে যথার্থ মূল্যায়ন করে যুগে যুগে এর সেবা করে গেছেন। তাদের কেউ কেউ অন্যান্য গ্রন্থের অধীনে 'ইসলামী রাজনীতি'র উপর নানা অধ্যায়-অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। কেউবা আবার পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। অসংখ্য গ্রন্থ তারা আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন, যার তালিকা পেশ করতে গেলে পৃথক পুস্তিকা প্রণয়ের প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমাদের বর্তমান আলেম সমাজের বেশীরভাগই সেসবের খবরই রাখেন না। ফলে, তাদের অধিকাংশই ইসলামে রাজনীতির ব্যাপারে অজ্ঞতা দেখিয়েছেন। তারা এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন; না বক্তব্যের মাধ্যমে, না লেখনীর মাধ্যমে। যতটুকু করেছেন, তা প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিবেচনায় যৎসামান্য বৈকি। এই অজ্ঞতার সুযোগে অনেকেই ইসলামকে মসজিদ, মাদরাসা, মক্তবের চার দেওয়ালে বন্দীর অপচেষ্টা করেছে! কেউবা ধর্মীয় জীবনে ধর্ম-কর্ম পালন করলেও

বৈষয়িক জীবনে নাস্তিকতার চাদর গায়ে জড়িয়েছে। কেউবা ইসলামী রাজনীতির নামে 'বিকৃত ইসলামী রাজনীতি' চর্চা করেছে। কেউবা বস্তাপঁচা নানা মতাদর্শ আমদানি করে পরিবেশ নষ্ট করেছে, ছড়িয়েছে নানা কুফরী মতবাদ। ফলে, রাজনীতির নামে পশ্চিমা নোংরা রাজনীতির হিংস্র ছোবলে সবাই আজ ক্ষতবিক্ষত, অশান্তির দাবানলে গোটা জাতি ভস্মিত।

ইসলাম মানবতার উভয় জীবনের সার্বিক কল্যাণের প্রতি যারপর নেই গুরুত্ব দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জনগণের জন্য প্রণয়ন করেছে 'ইসলামী রাজনীতি'। যার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে জনগণের ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি নিশ্চিত করা। সেজন্য, 'শাসক কর্তৃক এমন কর্ম সম্পাদনকে ইসলামী রাজনীতি বলা হয়েছে, যাতে বিশেষ কোন কল্যাণ আছে বলে তিনি মনে করেন- যদিও ঐ বিষয়ের আনুষঙ্গিক দলীল না থাকে'।[১]

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক পবিত্র কুরআন সংকলন, ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক 'আল-মুআল্লাফাতু কুলূবুহুম'-এর হিছ্ছা সাময়িক স্থগিতকরণ, উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক সকলকে একটিমাত্র ক্বিরাআতে একত্রিতকরণ ইসলামী রাজনীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এসব বিষয়ে কুরআন-হাদীসের সরাসরি কোন বক্তব্য না আসলেও তারা বিশেষ লক্ষ্য ও কল্যাণ বিবেচনায় সেগুলি সম্পাদন করেছিলেন। ইসলামী রাজনীতির এমন আরো বহু উদাহরণ পেশ করা যাবে।

অন্যভাবে, 'দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে- তাদেরকে এমন পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের সংশোধন করাকে ইসলামী রাজনীতি বলা হয়েছে'।[২] বুঝা গেলো, উভয় জগতে মানুষের সার্বিক কল্যাণ, অনাবিল সুখ–শান্তি নিশ্চিত করাই ইসলামী রাজনীতির গোড়ার কথা। 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন' নিশ্চিত করা ইসলামী রাজনীতির আরেকটি মৌলিক লক্ষ্য। তবে, ইসলামী রাজনীতি বাস্তবায়নের অন্যতম শর্ত হচ্ছে, তা কুরআন, হাদীস, ইজমা বা কিয়াসের বিরোধী হওয়া চলবে না এবং শরীআতের সাধারণ নীতির সাথে অমিল হওয়া যাবে না।

ইসলামী রাজনীতি বাস্তবায়িত করতে চাই সত্যিকারের সেই মুসলিম শাসক, যিনি সর্বদা ইসলামী বিধি-বিধান ও আইন বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। সম্ভবত শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এই উপলব্ধি থেকেই তার 'আস-সিয়াসাহ আশ-

[১] ইবনে আবেদীন, রদ্দুল মুহতার আলাদ-দুররিল মুখতার, দারুল ফিকর, বৈরূত, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৪১২ হি./১৯৯২ খৃ., ৪/১৫।

[২] আবুল বাক্বা আল-হানাফী, আল-কুল্লিয়্যাত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরূত, তা. বি., পৃ: ৫১০।

শারঈয়্যাহ ফী ইছলাহির রা'ঈ ওয়ার রা'ইয়্যাহ' পুস্তকটি রচনা করেছিলেন। মুসলিমদের ব্যর্থতা, তাদের ধন-মাল-রাষ্ট্র দখল, তাদের উপর শত্রুদের দুঃসাহস প্রদর্শনের মূলেই রয়েছে প্রথমতঃ শাসকশ্রেণীর মধ্যে পচন, অতঃপর সাধারণ জনগণের মধ্যে পচন। আর এই পচন ধরার অন্যতম কারণ তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক নষ্ট হয়ে যাওয়া।[৩]

বুঝা যাচ্ছে, আমরাই আমাদের উপর আপতিত শাসন-শোষণের মূল কারণ। তাছাড়া সত্যিকারের মুসলিম শাসক না হলে শরীআতের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিধান আমলহীন থেকে যাবে। বিশেষ করে, ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া 'জিহাদ' বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। আর তা সম্ভব না হলে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হবে না এবং দীন পুরোপুরি ক্বায়েম হবে না। মনে রাখতে হবে, এটি ইসলামী রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এছাড়া হুদূদ[৪], কিসাস[৫], তা'যীর[৬] কস্মিনকালেও বাস্তবায়িত হবে না। ফলে, সমাজে খুন-খারাবি, চুরি-ডাকাতি, অন্যায়-অনাচার, যেনা-ব্যভিচার, হত্যা-লুণ্ঠন, জুয়া-মদ্যপান, ফেতনা-ফাসাদ ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়বে। শান্তির আশা করাও ভুল হবে। শান্তির জন্য মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের সাথে সাথে 'নিরাপত্তা' সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন; বরং নিরাপত্তাই সর্বাগ্রে। কিন্তু ইসলামী রাজনীতির অবর্তমানে নিরাপত্তার 'নি'ও কল্পনা করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[৩] দ্রষ্টব্যঃ ইবনু তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) প্রণীত 'আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়্যাহ ফী ইছলাহির রা'ঈ ওয়ার রা'ইয়্যাহ' বইয়ের মুহাক্কিক্ববৃন্দের ভূমিকা, পৃঃ هـ, এহ্ইয়াউত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, প্রথম প্রকাশঃ ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খৃ.।

[৪] হুদূদ হাদ্দ-এর বহুবচন। শরীআত নির্ধারিত শাস্তিকে হাদ্দ বলে, যা আল্লাহ বা বান্দার হক্ব হিসাবে ওয়াজিব হয় *(আল-মাউসূ'আতুল ফিক্বহিইয়্যাতুল কুয়েতিইয়্যাহ, ১২/২৫৪-২৫৫, ইসলাম ও ওয়াক্বফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কুয়েত, প্রকাশকাল: ১৪০৪-১৪২৭ হিজরী)*। যেসব অপরাধে শরীআত হাদ্দের বিধান প্রণয়ন করেছে, সেগুলি হলো- যেনা, যেনার অপবাদ, চুরি, নেশা করা, ত্রাস সৃষ্টি করা, ইসলাম ত্যাগ করা ও চরমপন্থা অবলম্বন।

[৫] অপরাধীর সাথে ঠিক তদ্রুপ আচরণ করাকে 'কিসাস' বলে, যেরূপ আচরণ সে নিজে অন্যের সাথে করেছে *(প্রাগুক্ত)*। যেমনঃ জানের বদলা জান, চোখের বদলা চোখ, নাকের বদলা নাক ইত্যাদি।

[৬] শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত নয় এমন শাস্তিকে 'তা'যীর' বলে, যা আল্লাহ বা বান্দার হক্ব হিসাবে অবধারিত হয়। তা'যীর সাধারণত সেসব পাপের ক্ষেত্রে হয়, যেগুলিতে হাদ্দ ও কাফফারা কোনোটাই নির্ধারিত থাকে না *(প্রাগুক্ত)*। যেমনঃ এমন চুরি করা, যাতে কর্তনের বিধান নেই। যেনা ছাড়া অন্য কোন অপরাধের অপবাদ দেওয়া।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর যদি কাউকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করতে হবে এবং ভালোভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। হে বুদ্ধিমানগণ! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো' *(সূরা আল-বাক্বারাহ, ২/১৭৯)*।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ 'আর তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন' আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন,

جَعَلَ اللّٰهُ الْقِصَاصَ حَيَاةً، فَكَمْ مِنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يقتُل، فَتَمْنَعُهُ مَخَافَةَ أَنْ يُقتل

'আল্লাহ কিসাসকে 'জীবন' হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। কেননা, কত মানুষ (অন্যকে) হত্যা করতে চায়; কিন্তু নিজের নিহত হওয়ার ভয় তাকে বাধা প্রদান করে'।[৭] কুরআন-হাদীসের এজাতীয় বক্তব্য স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, হুদূদ, কিসাস, তা'যীরের অন্তরালে লুক্কায়িত রয়েছে জান-মাল, ইযযত-আব্রু, বুদ্ধি-বিবেক, বংশ ইত্যাদির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ-এর সম্মানিত পরিচালক ডা. মোশাররফ হোসেনকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই একারণে যে, মূলত তিনিই এধরনের একটি পুস্তক রচনা বা সংকলের মূল উদ্দীপক। ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের উপর, বিশেষ করে 'সহীহ আকীদা'র উপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমি তাকেসহ মাকতাবাতুস সুন্নাহ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!

বিনীত, আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী হাফিযাহুল্লাহ।

---

[৭] ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, তাহক্বীক্ব: সামী ইবনে মুহাম্মাদ সালামাহ, দারু ত্বাইবা, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৪২০ হি./১৯৯৯ খৃ., ১/৪৯২।

সিয়াসাহ বা রাজনীতি হচ্ছে, মানুষের কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার পদ্ধতির নাম।[৮] এটা দু'ভাগে বিভক্ত:

১। অভ্যন্তরীণ

২। বাইরের (পররাষ্ট্রনীতি)।

বাইরের রাজনীতি (পররাষ্ট্রনীতি) দু'টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:

(১) **শত্রুর মূলোৎপাটন ও তাকে পরাজিত করার জন্য উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করা।** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

'আর তোমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি ও সদাপ্রস্তুত ঘোড়া তাদের মোকাবেলার জন্য যোগাড় করে রাখো। এর মাধ্যমে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে' *(সূরা আল-আনফাল, ৮:৬০)*।

(২) **ঐ শক্তিকে ঘিরে মযবুত ঐক্য গড়ে তোলা (জামা'আত বদ্ধ হওয়া)।**

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

'তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না' *(সূরা আলে ইমরান, ৩: ১০৩)*। তিনি আরো বলেন,

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

'তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তাহলে তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিবে এবং তোমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাবে' (সূরা আল-আনফাল, *৮:৪৬)*।

কুরআন নিয়ম ব্যক্ত করেছে যে, এ রাজনীতি রক্ষা করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে সন্ধি ও চুক্তি করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে।

---

[৮] **"ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা"** মূল: আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ আল আমীন ইবনে মুহাম্মাদ মুখতার শানক্বীতি (১৩০৫-১৩৯৩ হি), ১/১৯-২১, অনুবাদ: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল কাফী

আবার দরকার পড়লে শত্রুদের মুখের উপর চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ

'এ ধরনের লোকদের সাথে তোমরাও নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে' *(সূরা আত-তাওবা, ৯:৪)*। তিনি আরো বলেন,

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ

'যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য সোজা-সরল থাকে, ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য সোজা-সরল থাকো' *(সূরা আত-তাওবা, ৯:৭)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ

'আর যদি কখনো কোন জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের খেয়ানতের (চুক্তি ভঙ্গের) আশঙ্কা থাকে, তাহলে তার চুক্তি প্রকাশ্যে তার সামনে ছুড়ে দাও' *(সূরা আল-আনফাল, ৮:৫৮)*। তিনি আরো বলেন,

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

'আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে বড় হজ্জের দিনে সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণ ঘোষণা হচ্ছেঃ আল্লাহ ও তার রাসূল মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত' *(সূরা আত-তাওবা, ৯:৩)*। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিচ্ছেন।

কুরআন আরো হুকুম দিচ্ছে যে, শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও কুটচাল থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তাদেরকে কোন প্রকার সুযোগ দেয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

'হে ঈমানদারগণ! শত্রুর ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ থেকে সর্বদা সতর্ক ও প্রস্তুত থাকো' *(সূরা আন-নিসা, ৪:৭১)*। তিনি আরো বলেন,

وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ

'আর তারাও সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র বহন করবে। কারণ কাফেররা সুযোগের অপেক্ষায় আছে, তোমাদের যদি অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক

হও, তাহলে তারা তোমাদের উপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে' *(সূরা আন-নিসা, ৪:১০২)*। এরূপ অনেক আয়াত আছে।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি

অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মূল বিষয় হচ্ছে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অন্যায় প্রতিহত করা এবং অধিকারসমূহ ন্যায্য পাওনাদারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ৬টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা-

১। দীন ইসলামের হেফাযত করা: ইসলামী শরীআত দীনকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে তাগিদ দিয়েছে। এ জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

'যে মুসলিম তার দীনকে পরিবর্তন করবে, তাকে হত্যা কর'। সহীহ বুখারী, হা/৩০১৭

এ হাদীছে দীনকে ইচ্ছামত পরিবর্তন ও তা নষ্ট করার পথ চূড়ান্তভাবে রোধ করা হয়েছে।

২। জীবন রক্ষা করা: আল্লাহ মানুষের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যেই কিছাছ তথা হত্যার বদলে হত্যার বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ

'তোমাদের জন্য কিছাছে রয়েছে জীবন' *(সূরা আল বাকারা ২:১৭৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

'নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিছাছ ফরয করা হয়েছে' *(সূরা আল বাকারা ২:১৭৮)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا

'কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে আমি তার উত্তরাধিকারীকে অধিকার দিয়েছি (কিছাছ দাবী করার বা ক্ষমা করে দেওয়ার)' *(সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৩৩)*।

৩। **আক্বল বা বিবেক রক্ষা:** মানুষের বিবেক-বুদ্ধি রক্ষা করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে পবিত্র কুরআন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও’ *(সূরা মায়িদা ৫:৯০)*। হাদীছে এসেছে,

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

‘নেশা জাতীয় সকল দ্রব্য হারাম। যার বেশি পরিমাণ সেবন করলে নেশা সৃষ্টি করে, তার অল্পও হারাম’।[৯]

আর মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে রক্ষার স্বার্থেই মদপানকারীর উপর দণ্ডবিধি ধার্য করা হয়েছে।

৪। **বংশ রক্ষা:** বংশের ধারাকে সংরক্ষণ করার জন্য আল্লাহ ব্যভিচারের দণ্ড প্রণয়ন করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

‘ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ’টি করে বেত্রাঘাত কর’ *(সূরা নূর ২৪:২)*।

৫। **মান-সম্মান রক্ষা:** মানুষের মান-সম্মান রক্ষা করার জন্যই আল্লাহ অপবাদ দানকারীকে আশিটি বেত্রাঘাত করার বিধান দিয়েছেন । আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

‘আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে না আসে, তবে তাদেরকে আশি বেত্রাঘাত কর’ *(সূরা নূর ২৪:৪)*।

---

[৯] সহীহ: ইবনে মাজাহ, হা/৩৩৯২, সহীহ বুখারী, হা/৪৩৪৩, সহীহ মুসলিম, হা/১৭৩৩, তিরমিযী, হা/১৮৬৪, নাসাঈ, হা/৫৫৮২।

৬। সম্পদ রক্ষা: ধন-সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ চোরের হাত কাটার আইন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

'আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের ফল ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিস্বরূপ' *(সূরা মায়িদা ৫:৩৮)*।

অতএব সুস্পষ্ট হলো যে, কুরআনের অনুসরণই মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের সকল স্বার্থ ও কল্যাণ নিশ্চিত করার যিম্মাদার।

নাস্তিক্যবাদী ও জাহিলী দলের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার বিধান[১০]

১। নাস্তিক্যবাদ: যেমন কম্যুনিজম (সমাজতন্ত্র), সেক্যুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ), পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদসহ অন্যান্য নাস্তিক্যবাদী কুফরী মতবাদের সাথে কোন ব্যক্তি নিজেকে সম্পৃক্ত করলে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় (ঈমান ভঙ্গ হয়)। এ সকল দলের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করলেও সে বড় মুনাফিক। কারণ, মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করলেও অভ্যন্তরীণভাবে তারা কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

'আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলিমদের সাথে) উপহাস করি মাত্র *(সূরা আল বাকারা, ২:১৪)।* অপর আয়াতে তিনি বলেন,

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

---

[১০] শাইখ ড. সালেহ আল-ফাওয়ান আল ফাওয়ান (হাফিযাহুল্লাহ) 'আকীদাতুত-তাওহীদ' বই থেকে।

‘এরা এমনই মুনাফিক্ব, যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওঁৎপেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন বিজয় অর্জিত হয়, তবে তারা বলে, আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফেরদের যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলিমদের কবল থেকে রক্ষা করিনি?’ *(সূরা আন নিসা, ৪:১৪১)।*

অতএব, এ সকল ধোঁকাবাজ মুনাফিক্বের প্রত্যেকে দ্বি-মুখী নীতি অবলম্বন করে। এক নীতিতে মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, আর অপর নীতিতে তারা তাদের নাস্তিক দোসরদের নিকটে ফিরে যায়। এদের রয়েছে দু’টি জিহ্বা। একটি দিয়ে বাহ্যিকভাবে সে মুসলিমদেরকে গ্রহণ করে, অপরটি দ্বারা তারা তাদের গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করে। ঠিক যেমনটি আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতে বর্ণিত,

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

‘আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা মুসলিমদের সাথে উপহাস করি মাত্র’ *(সূরা আল বাক্বারা, ২:১৪)।*

এরা সব সময় কুরআন-সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কুরআন-সুন্নাহর অনুসারীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ও তাদেরকে হীন চোখে দেখে। সামান্য দুনিয়াবী জ্ঞানের অহংকারে তারা কুরআন-সুন্নাহর বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে। তাদের এ দুনিয়াবী তুচ্ছ বিদ্যা তাদেরকে কেবল মন্দের দিকে ধাবিত করে। তাইতো তারা সর্বদা কুরআন-সুন্নাহর অনুসারীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

‘বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কু-মতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে’ *(সূরা আল বাক্বারা, ২:১৫)*। আল্লাহ মুমিনদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক’ *(সূরা আত-তাওবাহ, ৯:১১৯)*।

নাস্তিক্যবাদী এসব দল পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত। কারণ তারা মিথ্যা বা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত। **কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্র** আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, আসমানী দীনসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। যে ব্যক্তি আকীদা বা বিশ্বাসহীন জীবন যাপনে সন্তুষ্ট এবং জ্ঞান দ্বারা সু-প্রমাণিত মৌলিক সত্য ও নিশ্চিত বিষয়সমূহকে অস্বীকার করে, সে স্বীয় জ্ঞানকে অকেজো করে নিজেকে পাগলে পরিণত করে।

আর **সেক্যুলারিজম বা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ** সকল দীন বা ধর্মকে অস্বীকার করে এবং বস্তুবাদের উপর (অর্থের উপর) নিজেদের ভিত গড়তে চায়, যার কোন দিক নির্দেশনাকারী থাকে না। দুনিয়াতে জানোয়ারের মতো জীবন যাপন ছাড়া এদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

অন্যদিকে **পুঁজিবাদের** চিন্তাধারা হলো হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধের তোয়াক্কা না করে যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করা। দরিদ্র ও ফকীর-মিসকীনদের প্রতি তাদের কোন দয়া-মায়া নেই। এদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হলো আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী সূদ। এতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায়। সূদভিত্তিক অর্থনীতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর রক্ত পর্যন্ত চুষে খায়।

যার মধ্যে সামান্যতম ঈমান আছে, সে তো দূরের কথা এমনকি কোন বিবেকবান ব্যক্তি কি জ্ঞান, দীন, জীবনের সঠিক কোন উদ্দেশ্য ও অগ্রগতি ছাড়া এ সকল মতবাদের উপর জীবন-যাপনে সন্তুষ্ট থাকতে পারে?! আর তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে পারে?!

সঠিক দীনের অনুপস্থিতি, নষ্ট ঈমান-আকীদা এবং বিধর্মীদের অনুচর-অনুগত হয়ে বেড়ে উঠার কারণে এসকল ভ্রান্ত মতবাদ ইসলামী দেশসমূহের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

২। জাহিলী যুগের কোন মতবাদ, বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার দিকে সম্পৃক্ত হওয়া আরেক প্রকার কুফরী ও ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার বিষয়। কারণ ইসলাম সকল প্রকার জাতীয়তাবাদ এবং জাহিলী মতবাদ ও প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

‘হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক

পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন *(সূরা আল হুজুরাত, ৪৯:১৩)।* রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ

'যে ব্যক্তি আছাবিয়্যাহর[১১] দিকে আহ্বান জানায়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। যে আছাবিয়্যাহর জন্য যুদ্ধ করে, সেও আমাদের দলভুক্ত নয় এবং যে আছাবিয়্যাহর জন্য রাগ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[১২]

এসব জাহিলী দলাদলি মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন এক জাতিতে পরিণত করেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং সৎ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন ও মতভেদ করতে নিষেধ করে ইরশাদ করেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তার অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছো' *(সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩)।*

আল্লাহ তা'আলা চান আমরা যেন একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হই। পরিতাপের বিষয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ মুসলিম দেশগুলোর উপর আগ্রাসন করার পর মুসলিম উম্মাহ্ এ সকল রক্তক্ষয়ী উগ্রবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং স্বদেশ প্রীতির নিকটে বশ্যতা স্বীকার করেছে।

সাথে এসকল বিষয়কে মুসলিমগণ ইলমী, প্রকৃত ও বাস্তব এমন বিষয় বলে মেনে নিয়েছে, যেন তা থেকে বাঁচার কোন বিকল্প পথ নেই। অথচ এই জাতীয়তাবাদ ও উগ্রবাদকে ইসলাম মিটিয়ে দিয়েছিল। আর তাকে সঞ্জীবিত করার জন্য মুসলিমগণ

[১১] দল, গোত্র, বর্ণ, দেশ, আঞ্চলিকতা, জাতীয়তা ইত্যাদি কেন্দ্রিক সংকীর্ণতাকে আছাবিয়্যাহ বলা হয়।

[১২] যঈফ: সুনানে আবূ দাউদ ৫১২১, ৫১২৩। তবে অর্থের দিক থেকে সহীহ । দেখুন: সহীহ মুসলিম ১৮৪৮, সহীহ: ইবনে মাজাহ ৩৯৪৮, নাসাঈ ফিল কুবরা ৩৫৬৬।

আজ দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে। তারা জাতীয়তাবাদ ও উগ্রবাদকেই যথেষ্ট মনে করছে এবং এর নিদর্শনসমূহকে পুনর্জীবিত ও ইসলামের উপর এর আগ্রাসনের সময়কালকে নিয়ে তারা গর্ব করছে। এ ধারার নামধারী মুসলিমরাই আজ ইসলামকে জাহিলিয়াত বলে নাম করণের জন্য চাপ প্রয়োগ করছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এ জাহিলিয়্যাত থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে তাদেরকে এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে উৎসাহিত করেছেন।

মুমিনের উচিৎ, অতীত জাহিলিয়াতের উল্লেখ না করা। যদি উল্লেখ করতেই হয়, তবে ঘৃণা-অসন্তুষ্টি, অপছন্দ, গাত্রদাহ্ ও গা শিহরণসহ উল্লেখ করবে। আটকাবস্থায় কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত ও নির্যাতিত কয়েদী বা বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলে গাত্রদাহ্ ও শিহরণ ব্যতীত কি সে তার শাস্তির কথা উল্লেখ করতে পারে? কঠিন ও দীর্ঘ মৃত্যুরোগ হতে মুক্তি লাভকারী ব্যক্তি কি তার অসুস্থতার দিনগুলো স্মরণ করতে গিয়ে হতবিহ্বল ও অবস্থা পরিবর্তন না হয়ে পারে?

জানা আবশ্যক যে, এ সকল দলাদলি ও মতবাদ এমন আযাব, যা আল্লাহ্ তা'আলা তার শরীআত হতে বিমুখ ও বেদীন ব্যক্তিদের প্রতি প্রেরণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

'আপনি বলুন, তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দিবেন এবং একজনকে অন্যের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন *(সূরা আল আন'আম, ৬:৬৫)*। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ

'ইমাম ও বিচারকরা যখন আল্লাহর কিতাব কুরআন অনুযায়ী ফায়সালা না করে এবং আল্লাহর বিধানকে প্রাধান্য না দেয়, তখন তিনি তাদের পরস্পরের মাঝেই ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে দেন'। হাসান: সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০১৯।

কোন দলের জন্য উগ্রতা ও গোঁড়ামী পোষণ করা অন্যের নিকট হতে সত্য গ্রহণে বাধা দেয়। যেমন ইয়াহূদীদের অবস্থা, যাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ

'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ যা পাঠিয়েছেন তা মেনে নাও, তখন তারা বলে, আমরা মানি, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে। অথচ এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যায়ন করে ঐ গ্রন্থের, যা তাদের কাছে রয়েছে' *(সূরা আল বাক্বারা, ২:৯১)*।

অনুরূপ জাহিলী যুগের লোকেরাও নিজেদের দাপ-দাদার মতের প্রতি গোঁড়ামী বশতঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকটে যে সত্য নিয়ে এসেছিলেন, তা তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

'আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর, যা আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও' *(সূরা আল বাক্বারা, ২:১৭০)*।

এসব দলের অনুসারীরা নিজ নিজ দল ও দলের আদর্শকে ইসলামের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ ইসলাম হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য আল্লাহর বিশেষ দান বা অনুগ্রহ।

শরীআহ ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনা করার বিধান[১৩]

ইমামুল মুসলিমীন বা খলীফার উপর ওয়াজিব হচ্ছে, আল্লাহর অবতীর্ণ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী মানুষকে পরিচালিত করা। আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কোন কিছু দ্বারা ফায়সালা করা কারো জন্য জায়েয নেই।

আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ফাসছালা করা কুফরী (**كفر**), যুলম (**ظلم**) ও ফাসেকী (**فسق**)। মূলত ঈমান এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা ফায়সালার বিষয়টি কোন বান্দার হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। কেননা এতদুভয়ের একটি অপরটির বিপরীত। সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং ত্বগূতকে অস্বীকার করা ছাড়া প্রকৃত ঈমান কল্পনা করা যায় না।

১। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

‘আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার মাধ্যমে ফায়সালা করে না, তারাই হচ্ছে কাফের’ *(সূরা মায়িদা, ৫:৪৪)*।

২। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

‘আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফায়সালা করবে না, তারাই হচ্ছে যালিম’ *(সূরা মায়িদা, ৫:৪৫)*।

৩। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফায়সালা না করে, তারাই হচ্ছে ফাসিক’ *(সূরা মায়িদা, ৫:৪৭)*।

---

[১৩] মাওসূআতুল ফিকহিল ইসলামী, খিলাফাহ অধ্যায়, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী, ৫/২৮৮।

৪। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'অতএব, তোমার রবের কসম! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়' (সূরা আন-নিসা, ৪:৬৫)।

৫। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

'তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা ত্বাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে' *(সূরা আন-নিসা' ৪:৬০)।*

শরীআতের হুকুম-আহকাম বিরোধী কর্মে শাসকদের আনুগত্য করা বড় শিরক[১৪]

শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ হারামকে হালাল করতে গিয়ে শরীআতের হুকুম-আহকাম বিরোধী মানবরচিত আইনের আশ্রয় নিলে তাতে শাসকদের আনুগত্য করা বড় শিরক। যেমন-

- সূদের বৈধতা দেয়া
- যেনা-ব্যভিচারের অনুমোদন দেয়া
- মদ্যপান অনুমোদন করা
- উত্তরাধিকার সত্বে নারী-পুরুষকে সমান করে দেয়া
- নারীদেরকে বেপর্দা হওয়ার অনুমতি দেয়া
- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পরিবেশ তৈরী করা

  কিংবা হালালকে হারাম করার ক্ষেত্রেও শাসকদের আনুগত্য করা বড় শিরক। যেমন-

  পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ হারাম করা। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমকে পরিবর্তন করে শয়তানের প্রচলিত আইন-কানুন দ্বারা তা বদলিয়ে ফেলা বড় শিরক।

সুতরাং যে এসব ক্ষেত্রে শাসকদের আনুগত্য করবে, তাতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং ভালো মনে করবে, সে মুশরিক ও কাফির হিসাবে গণ্য হবে। আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এমনিভাবে ফকীহগণের যেসব কথা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দলীলের বিপরীত, ঐসব কথাতে তাদের অনুসরণ করাও বড় শিরক। বিশেষ করে যখন সেই কথাগুলো কিছু লোকের প্রবৃত্তি ও মনোবাসনার সাথে মিলে যায়। বিভিন্ন বিষয়ে সুযোগসন্ধানী অর্ধশিক্ষিত কতিপয় লোককে এমনই করতে দেখা যায়।

অথচ মুজতাহিদদের ঐসব কথা গ্রহণ করা আবশ্যক, যার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর দলীল রয়েছে এবং তাদের যেসব কথা দলীলবিরোধী তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

---

[১৪] আল ইরশাদ ইলা সহীহিল ইতিকদ হতে, ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান রচিত, মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত।

জাহিলিয়্যাতের বিধান[১৫]

যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ফায়সালা করলো, সে জাহিলিয়্যাতের বিধান দ্বারা ফায়সালা করলো। আর যেসব অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়, আল্লাহ ও তদীয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিধান বর্জন করে, জাহেলী বিধানকে শরীআত ও জীবন যাপনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে এবং মানুষকে তা মানতে বাধ্য করে, তারা সবাই এ ত্বগূত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ফলে, চার শ্রেণীর মানুষ এ মহাপাপে পতিত হয়:

১. বিধান/আইন প্রণেতা (**المشرِّع**): যে এমন সব আইন প্রণয়ন করে, যেগুলি দ্বারা মানুষের মধ্যে ফায়সালা করা হয়, তাকে আইন প্রণেতা বলে।

২. সমর্থক ও রক্ষাকারী (**المدافع**): যে ব্যক্তি উক্ত আইন ও বিধান বাস্তবায়ন করে এবং তা সমর্থন ও রক্ষা করে, তাকে সমর্থক ও রক্ষাকারী বলে।

৩. ফায়সালাকারী (**الحاكم**): যে উক্ত আইন ও বিধান অনুযায়ী মানুষের মাঝে ফায়সালা করে, তাকে ফায়সালাকারী বলে।

৪. শাসিত (**المحكوم**): যদি সে ঐ বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং তার অনুসরণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

'তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?' (সূরা আল মায়িদা, ৫:৫০)।

উম্মু সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ

'অচিরেই এমন কতক আমীরের উদ্ভব ঘটবে, তোমরা তাদের চিনতে পারবে ও অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি তাদের স্বরূপ চিনল, সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের অপছন্দ করল, সে নিরাপদ হলো। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পছন্দ করল ও তাদের অনুসরণ করল, সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। সহীহ মুসলিম হা/১৮৫৪।

---

[১৫] মাওসূআতুল ফিকহিল ইসলামী, খিলাফাহ অধ্যায়, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী ৫/২৮৯।

নারী নেতৃত্বের বিধান[১৬]

প্রত্যেকটি বিষয়, যার কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার ছাহাবার যুগে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা তা করেননি, অথচ তা করা সম্ভব ছিল, তা-ই হচ্ছে বিদ‘আত। অতএব, তা করা বা তার স্বীকৃতি দেওয়া বা তদনুযায়ী আমল করা জায়েয নেই।

ফলে, যে ব্যক্তি নারীকে পুরুষদের বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট, নেত্রী, মন্ত্রী, বিচারক, শূরা সদস্য এবং অন্যান্য বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দেওয়ার বৈধতা দেয়, যেগুলি শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং যেগুলিতে নারী-পুরুষের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে, তাহলে সে আল্লাহর শরীআতের বিরুদ্ধাচরণ করে, দীনের মধ্যে নতুন জিনিসের জন্ম দেয় এবং এমন বিধান প্রণয়ন করে, যার অনুমোদন আল্লাহ দেননি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ‘মাজলিসে শূরা’ বা ‘পরামর্শ সভা’ ছিল, অথচ অনেক জ্ঞানী মহিলা থাকা সত্ত্বেও একজন নারীও তার সদস্য ছিলেন না। এমনকি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণও শূরা সদস্য ছিলেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم

‘পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে’ [সূরা আন-নিসা, ৪:৩৪]।

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».

আবু বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কথা দিয়ে আল্লাহ আমাকে উষ্ট্রের যুদ্ধের সময় বড়ই উপকৃত করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যের লোকেরা কিসরার মেয়েকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেছে, তখন তিনি বললেন, ‘সে জাতি কখনই সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন স্ত্রীলোকের হাতে অর্পণ করে’। সহীহ বুখারী হা/৭০৯৯।

---

[১৬] মাওসূআতুল ফিকহিল ইসলামী, খিলাফাহ অধ্যায়, মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

ইসলামী রাজনীতি বিষয়ক ফতোয়া

শাইখ মুক্ববিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী রহিমাহুল্লাহ

প্রশ্ন ০১: **সিয়াসাহ এর আভিধানিক অর্থ কী? সিয়াসাহ কত প্রকার।**

জবাব: সিয়াসাহ এর আভিধানিক অর্থ হলো: শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। এখান থেকেই "রাজা-বাদশাহ কর্তৃক প্রজাদের যাবতীয় বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা" কথাটির উৎপত্তি।

শারঈ সিয়াসাহ হলো: কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে সমাজের যাবতীয় বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। **সিয়াসাহ হলো দীনের একটি অংশ।**

বুখারী ও মুসলিম সহীহাইনে আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، إِنَّهُ سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ

'নিশ্চয় ইসরাইল গোত্রে তাদের নবীগণ তাদেরকে নেতৃত্ব দিতেন। যখনি কোনো নবী মৃত্যুবরণ করতেন, অপর নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোনো নবী আসবেন না। আমার পরে অচিরেই খলীফাগণ আসবে। যাদের সংখ্যা হবে অনেক বেশী'। সহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/৭৯৪৭।

সিয়াসাহ তিন প্রকারে বিভক্ত:

(১) সিয়াসাহ শার'ইয়্যাহ (سياسة شرعية) : আমীর-উমারা, বাদশা, শাসক ও নেতাশ্রেণি কর্তৃক জনগণকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালনা করাই হচ্ছে সিয়াসাহ শার'ইয়্যাহ। সুন্নাতেরএটাই হলো শারঈ সিয়াসাহ ।

(২) শয়তানী সিয়াসাহ (سياسة شيطانية) : মিথ্যা ও ধোঁকাবাজির শাসনব্যবস্থা, যার চিত্র বর্তমান যুগে বিদ্যমান।

(৩) মুবাহ সিয়াসাহ (سياسة مباحة) : মুবাহ সিয়াসাহ হলো রাজা-বাদশাদের শাসনব্যবস্থা। অর্থাৎ শরীআতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় এমন আইনব্যবস্থার দ্বারা প্রজাদেরকে সুষ্ঠুরূপে শাসন করা। এটা হলো মুবাহ (বৈধ) শাসনব্যবস্থা।

প্রশ্ন ০২: **ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার লক্ষ্যে** নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **কোন্ কোন্ ধাপগুলো অনুসরণ করেছেন?**

জবাব: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করেছেন। ধাপগুলো হলো:

(১) নিষ্ঠাপরায়ণ সত্যবাদী ব্যক্তি গঠন।

(২) দীনী শিক্ষা।

(৩) ধৈর্য্যের দীক্ষা। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণের সঙ্গে ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করেছেন। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ধৈর্য ধারণ করেছেন। শত্রুদের আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। নিকটাত্মীয়দের পরীক্ষায় পতিত হয়েছেন। এমনি আরো বহু কঠিন পরীক্ষায় তারা ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

সুতরাং আমাদের করণীয় হলো, নিজেদেরকে ধৈর্য্য ধারণের ব্যাপারে প্রশিক্ষিত করে তোলা। জ্ঞান অর্জনে নিজেকে যোগ্য করে তোলা। উপকারী জ্ঞান অর্জনে নিজেকে দক্ষ করা। যেমনটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ করেছিলেন।

এরপরে কুরআনের জ্ঞান অর্জনে এবং কুরআনের উপরে আমল করার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে দক্ষ করে তোলা। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

প্রশ্ন ০৩: অনেকেই বলে থাকেন যে, সিয়াসাহ হলো এমন শাসনব্যবস্থা, যা শরীআতসম্মত হয়ে থাকে। শরীআত কর্তৃক নির্দেশিত শাসনব্যস্থা নয়। এই কথাটি কি ঠিক?

জবাব: সিয়াসাহ তিন প্রকারে বিভক্ত:

শারঈ সিয়াসাহ: যেই সিয়াসাহ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবর্তন করেছেন।

মুবাহ সিয়াসাহ: যেমন কিতাব ও সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন আইন দ্বারা প্রজাদের জন্য রাজা-বাদশা ও আমীরগণ কর্তৃক প্রণীত শাসনব্যস্থা।

শয়তানী সিয়াসাহ: এমন শাসনব্যস্থা, যা আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

আর শরীআত প্রদর্শিত আইন মেনে চলে এমন শাসনব্যবস্থার মাঝে আর উক্ত শাসনব্যবস্থার (মুবাহ সিয়াসাহ) মাঝে কোনো তফাৎ আছে বলে আমার মনে হয় না।

যদি শরীআতের আইন মোতাবেক্ব পরিচালিত শাসনব্যবস্থার দ্বারা এমন শাসনব্যবস্থা উদ্দেশ্য হয়, যা শরীআতের আইন মোতাবেক্ব ও শরীআতের আইন বিরোধী শাসনব্যস্থা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেটা উক্ত (শয়তানী) শাসনব্যবস্থা বলে বিবেচিত হবে। এমন শাসনব্যবস্থা (প্রশ্নে জিজ্ঞেসিত) আর উক্ত (শয়তানী) শাসনব্যবস্থার মাঝে কোনো তফাৎ আছে বলে আমার মনে হয় না।

প্রশ্ন ০৪: সফরের আমীর হওয়ার ক্ষেত্রে কি 'আম দলীলগুলোর বিচারে ইমাম কুরাইশী হওয়া শর্ত?

জবাব: সফরের আমীর হওয়ার জন্য কুরাইশী হওয়া শর্ত নয়; যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামাহ বিন যায়েদকে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন, যিনি কুরাইশী ছিলেন না। আর যায়েদ বিন হারিছাহকে যুদ্ধের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন, যিনি কুরাইশী ছিলেন না। নির্দিষ্টরূপে সফরের নেতৃত্ব ঐ নেতৃত্বের মত নয়, যেখানে আমীর তোমাকে যুদ্ধের জন্য আহবান করলে তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। আর যদি আমীর তোমাকে চলে যেতে বলে, তাহলে চলে যেতে হবে। না, বিষয়টি এমন নয়। বরং সফরের নেতৃত্ব সফর সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন কোথায় তোমরা যাত্রাবিরতি করবে, কোন পথ দিয়ে তোমরা গমন করবে। এমনিভাবে ঐ সকল বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেগুলো সফরের যাবতীয় বিষয়ের সাথে নির্দিষ্ট। আর এই ক্ষেত্রে কুরাইশী হওয়া শর্ত নয়, যেমনটি তুমি ইতোপূর্বে শুনেছ।

প্রশ্ন ০৫: নিজ এলাকা এবং সফরে থাকাকালে আমীর হওয়ার বিধান কী?

জবাব: সফরে আমীর হওয়ার ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"যখন তোমরা সফরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান কর আর তোমাদের সংখ্যা তিনজন হয়, তখন তোমরা তোমাদের মধ্যে কাউকে আমীর নিযুক্ত করো"। সুতরাং এটা শরীআতসম্মত।

আর স্থানীয় অঞ্চলের আমীর হলো উক্ত অঞ্চলের প্রধান দায়িত্বশীল বা বাদশাহ। কারো জন্য নিজেকে কোনো স্থানের আমীর পদে অধিষ্ঠিত করা জায়েয হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রধান দায়িত্বশীল অথবা বাদশাহর পক্ষ থেকে তাকে উক্ত পদের আমীর হিসেবে নিযুক্ত করা না হয়।

আর অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় আমীর নিযুক্ত করার বিষয়টি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে বিদ্যমান ছিল না, ঠিক এমনিভাবে আবূ বকর,

উমার ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর যুগেও ছিল না। আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ললাম এর শহরে এমন কাউকে জানি না, যে বলে, অমুক, অমুক ও অমুক ব্যক্তির আমীর হলো অমুক ব্যক্তি। এছাড়াও এটা মুসলিমদের একতাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

আমরা মিসরে গিয়ে দেখলাম, সেখানে তিনজন ব্যক্তি বিশিষ্ট এমন অনেক দল আছে, যাদের ভিন্ন ভিন্ন আমীরুল মুমিনীন ধার্য করা আছে। অথচ তারা অন্য দলগুলোর সাথে মিশে দুআ ও (আল্লাহর) প্রশংসায় ব্যস্ত থাকে। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

প্রশ্ন ০৬: সফরের নেতৃত্ব কখন থেকে শুরু হয় আর কখন তা শেষ হয়? সফরে কি নেতৃত্বের কোনো সুনির্ধারিত মেয়াদ আছে? কখনো কখনো এক অঞ্চলে এক মাস অথবা দুই মাস অথবা এর চেয়ে বেশী বা কম সময় অবস্থান করা হয় এরপরে ফিরে আসা হয়। এই ক্ষেত্রে নেতৃত্বের সময়সীমার বিধান কী? স্থানীয় অঞ্চলের নেতৃত্বকে সফরের নেতৃত্বের উপরে ক্বীয়াস করে একই বিধান সাব্যস্ত করা যাবে কি, যেই মতটা অনেকেই পোষণ করেন?

জবাব: সফরের নেতৃত্ব শুরু হয় সফর চলাকালীন, আর তা শেষও হয় সফরের দ্বারা। যখন তুমি কোনো শহরে উপনীত হয়ে সেখানে বিশদিনের অতিরিক্ত সময় অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তখন সেখানে কোনো নেতৃত্ব কার্যকর হবে না এবং পূর্ণ সালাত আদায় করতে হবে।

আর যখন তুমি কোনো শহরে উপনীত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিবে যে, যখন তোমার প্রয়োজন পূর্ণ হবে, তখন তুমি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। তাহলে তুমি সেখানে এক, দুই, অথবা তিন, অথবা চার, অথবা পাঁচ মাস অবস্থান করলেও তোমার উক্ত সময়কে সফরের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হবে। সুতরাং এই নেতৃত্ব শুরু হবে সফর চলাকালে আর শেষ হবে সফরের দ্বারা।

আর বিদেশে পড়ালেখা করার উদ্দেশ্যে কিছু মানুষ যখন যাত্রা করে, তখন তাদেরকে অনেকেই মুসাফির বলে ফতোয়া দেন, যা সঠিক নয়। কারণ, সে আভিধানিক, সামাজিক ও শরীআতের দৃষ্টিতে মুসাফির নয়।

বিশদিন এর মেয়াদ ধার্য করার পক্ষের দলীলটি সহীহ বুখারীতে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে উনিশদিন অবস্থান করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা সালাতে কসর করব। আর তাই ইবনু আব্বাস বলেন, আমরা যখন বিশদিনের অথবা উনিশদিনের অতিরিক্ত সময় অবস্থান করব, তখন পুর্ণ সালাত আদায় করব। এটা ইবনু আব্বাস এর

ইজতিহাদ। যেহেতু অন্য দলীলগুলোর মাঝে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই মর্মে কোনো দলীল পাওয়া যায়নি যে, "যে ব্যক্তি কোনো শহরে এতো এতো দিন অবস্থান করবে, তার জন্য পূর্ণ সালাত আদায় করা ফরয"।

শাওকানী নায়লুল আওত্বার গ্রন্থে বলেন, যখন তুমি কোনো শহরে গমন করবে, আর সেখানে চারদিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিবে, তখন তোমার উপরে পূর্ণ সালাত আদায় করা ফরয। কথাটির অর্থ প্রায় এমনি। তবে এই মেয়াদটি হলো হাদীসে বর্ণিত সর্বোচ্চ মেয়াদ, যা ইবনু আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তবে এটা একটি ইজতিহাদী মাসআলা। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

প্রশ্ন ০৭: শায়খ! ইখওয়ানী ও অন্যান্য সংগঠনের সদস্যরাও তো আমীরের বায়আত গ্রহণ করে, তাদের বায়আত কোন প্রকারের বায়আত বলে বিবেচিত হবে?

জবাব: বায়আত গ্রহণ করা হয় আমীরুল মুমিনীন, খলীফাতুল মুসলিমীন এর পক্ষে অথবা যাকে আমীরুল মুমিনীন কোনো নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত করেছেন একমাত্র তারই পক্ষে গ্রহণ করা যায়।

প্রত্যেক তিনজন অথবা চারজন অথবা দশজন অথবা বিশজনের একজন করে আমীরুল মুমিনীন থাকবে, এটা শরীআতে বিদআত বলে বিবেচিত হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মাঝে কোনো নতুন রীতি উদ্ভাবন করল, তার সেই রীতি বর্জিত হবে"। সহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।

তাদের বায়আত সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকারগুলোকে পূরণ করতে পারে না, যা এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো" (আল মায়িদাহ ৫:১)।

যখন অঙ্গীকারগুলো শারঈ অঙ্গীকার হবে। অন্যথায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

"আল্লাহর কিতাবে নেই এমন যে কোনো শর্ত বাতিল বিবেচিত হবে- যদিও তা শত শর্ত হয়"। সহীহ বুখারী হা/২১৬৮, সহীহ মুসলিম হা/১৫০৪।

প্রশ্ন ০৮: মুসলিম শাসকগণ কি বায়আত দেওয়ার উপযুক্ত?

জবাব: এই বিষয়টি আমি মুসলিম শাসকদের নিকটেই সমর্পিত করছি। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলব, যদি তারা আমেরিকার প্রতিনিধি হয়ে থাকে — আর তাদের নিজেদের ব্যাপারে তারাই সবচেয়ে ভালো জানেন — তাহলে তাদের নিকট বায়আত গ্রহণ করা সহীহ নয়।

আর যদি তারা আমেরিকার এজেন্ট না হয়, বরং তারা যদি ইসলামী শরীআহ এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে, তাহলে তাদের নিকট বায়আত গ্রহণ করা সহীহ হবে।

প্রশ্ন ০৯: 'যে ব্যক্তি বায়আত গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করল, সে জাহিলী যুগের ন্যায় মৃত্যুবরণ করল' এই হাদীসের ব্যাখ্যা কী?

জবাব: "যে ব্যক্তি বায়আত গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করল, সে জাহিলী যুগের ন্যায় মৃত্যুবরণ করল"। সহীহ মুসলিম হা/১৮৫১।

যখন মুসলিমদের কোনো কুরাইশী ইমাম থাকবে, আর সে বায়আত গ্রহণের দাবি জানাবে, তখন তার নিকট বায়আত গ্রহণ করা ওয়াজিব। আর এটাই শরীআহসম্মত পদ্ধতি।

ইসলামের শত্রুদের অন্ধ অনুসারীরা ভোট প্রদান ও নির্বাচনের পদ্ধতিকে বায়আতের পদ্ধতির বিকল্প বানিয়ে নিয়েছে। আর এটা নিঃসন্দেহে বাতিল পদ্ধতি। যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবাগণের বায়আত গ্রহণ করতেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তাঁরা বৃক্ষটির নীচে আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছে"। সূরা আল ফাতাহ ৪৮:১৮। এছাড়াও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার যুদ্ধে "যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন না করার" মর্মে কিছু সাহাবীর বায়আত নিয়েছেন। আর কিছু সাহাবীর বায়আত নিয়েছেন "আমৃত্যু যুদ্ধের ময়দানে অবিচল থাকার" মর্মে।

আর যখন কুরাইশী নয় এমন কোনো ব্যক্তি নেতৃত্ব দখল করে নিবে এবং তার ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়ে যাবে, তখন তার বায়আত গ্রহণ করতে হবে।

তবে এই সকল দল, যারা বিদআতি দল বলে বিবেচিত, যারা মুসলিমদের ঐক্যকে বিভক্ত করছে এবং দুর্বল করে দিচ্ছে, তাদের নিকট কোনো বায়আত গ্রহণ করা যাবে না। বরং এই বায়আত বাতিল বলে বিবেচিত হবে। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যে আমাদের এই দীনের মাঝে কোনো নতুন রীতি উদ্ভাবন করল, তার সেই রীতি বর্জিত হবে"। সহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।

প্রশ্ন ১০: খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা কি প্রত্যেক মুসলিমের উপরে ওয়াজিব?

জবাব: যেই সীমা পর্যন্ত মুসলিমগণ সক্ষমতা রাখে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার, সেই সীমা পর্যন্ত তাদের জন্য ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করা ওয়াজিব।

আমরা শীআদের ন্যায় বলতে পারি না: সর্বপ্রথম ওয়াজিব দায়িত্ব হলো একজন ইমাম (খলীফা) এর উপস্থিতি। বরং প্রথম ওয়াজিব হলো মানুষের জন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলতে জানা।

যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয বিন জাবালকে ইয়েমেনে প্রেরণ করলেন, তখন বললেন,

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ

"তুমি আহলুল কিতাব এর একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তাদেরকে সর্বপ্রথম তুমি যেই বিষয়ের দিকে আহবান করবে তা হলো: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল- এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। যদি তারা তোমার প্রস্তাবে সাড়া দেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপরে দিবসে এবং রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এই দাবি মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপরে যাকাত ফরয করেছেন। যা তাদের ধনী ব্যক্তিদের সম্পদ থেকে নিয়ে গরীবদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। তবে আমি তোমাকে তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করার ব্যাপারে সাবধান করছি।" সহীহ মুসলিম হা/১৯।

প্রশ্ন ১১: من مات ولم يبايع – "যে ব্যক্তি বায়আত গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করল" হাদীসটি কি শব্দগত মুতাওয়াতির নাকি অর্থগত?

জবাবঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি সহীহ। আর যখন কোনো হাদীস সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন সেই হাদীসের উপরে আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস থেকে যেই বিধান সাব্যস্ত হয়, সেই বিধান অনুসারে হাদীসটি মেনে নেওয়া ওয়াজিব।

সুতরাং হাদীসকে (বিধানগত দৃষ্টিকোণ থেকে) মুতাওয়াতির ও খবরে ওয়াহিদ এর প্রকারে বিভক্ত করা মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের রীতি, যা উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রের আলেমগণ তাদের থেকে গ্রহণ করেছে। যেমনটি সুয়ূতী তাদরীবুর রাবী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন ১২: বিভিন্ন দলের একাধিক আমীর থাকে। প্রত্যেক জামাআতের ভিন্ন ভিন্ন আমীর থাকে। তবে কখনো কখনো তার বায়আত গ্রহণ করা হয়। আবার কখনো তার বায়আত গ্রহণ করা হয় না। তারা বলে, এই নেতৃত্ব ক্ষমতা বাস্তবায়ন করার নেতৃত্ব নয়। বরং তা দাওয়াত কেন্দ্রিক নেতৃত্ব। যেমনটি তারা বলে থাকে, "আমরা ক্ষমতার বাস্তবায়ন করছি না। বরং তারা এই দাওয়াত কেন্দ্রিক নেতৃত্বকে সফর ও সফরের নেতৃত্বের সঙ্গে ক্বিয়াস করে। তারা বলে, আমরা এই সফর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে অবস্থান করছি। সুতরাং আমাদের একজনকে আমাদের আমীর বানানো অতীব জরুরী। এরপরে যখন তারা তাদের মধ্যে কোনো একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়, তখন তার আনুগত্যকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। আর যে উক্ত আমীরের কোনো প্রকার বিরোধিতা করে, তাকে গুনাহগার সাব্যস্ত করে। তার সঙ্গে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আর তার ব্যাপারে এই জাতীয় কুৎসা রটাতে থাকে। যেমনঃ কাফের বলা এবং এমনি আরো অনেক অপবাদ দিয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো তাকে তারা এই অপবাদও দিয়ে থাকে যে, সে উক্ত শাসকদের তাবেদারী করছে অথবা তাদের শাসনব্যবস্থার তাবেদারী করছে। তাহলে এমন নেতৃত্ব বিধিসম্মত কি-না? এই সকল জামাআতের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

জবাবঃ এই জামাআতগুলোর অবস্থা হলোঃ জাহিলী যুগের জামাআতগুলোর ন্যায় – উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে এই বার্তাটি পৌঁছে দেয়। আমরা যখন থেকে নিজেদের ব্যাপারে জানতে পেরেছি তখন থেকেই আমাদের এই দাবি। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম – সহীহাইনে জাবির এর হাদীসের বর্ণনানুসারে – বলেছেন, যখন একজন আনসারী ও একজন মুহাজির

ব্যক্তি ঝগড়া করতে লাগল। তখন আনসারী ব্যক্তিটি বলল, হে আনসারগণ! কোথায় আছো তোমরা, সাহায্য করো। তখন মুহাজির ব্যক্তিটি বলল, হে মুহাজির সম্প্রদায়! কোথায় আছো তোমরা, সাহায্য করো। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أَبِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ

"তোমরা জাহিলী যুগের পক্ষপাতিত্বের সুরে একে অপরকে আহবান করছ। অথচ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান। এমন আহবান বর্জন করো। কারণ এটা দুর্গন্ধময় আহবান"।

এবং সহীহ বুখারীর বর্ণনানুসারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

"যে ব্যক্তি নিজের গালে চপেটাঘাত করে, পোশাক ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলী যুগের পক্ষপাতিত্বের সুরে আহবান করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"। সহীহ বুখারী হা/১২৯৭।

মুসলিমগণ একটি সময় জুড়ে দলীয় পক্ষপাতিত্বের ফিৎনা থেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিল। যখন মুসলিমদের মাঝে এই দলগুলোর আবির্ভাব হলো, আমি হতবাক ও বিস্মিত হয়ে গেলাম, যখন আমি মিসরে থাকাকালে দেখলাম এমন তিনজন ব্যক্তি বিশিষ্ট দলকে, যাদের একজন করে আমীরুল মুমিনীন আছে। সুতরাং এটা এমন একটি ফিৎনা, যার দ্বারা ইসলামের শত্রুদের চক্ষু শীতল হয়।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম – বলেছেন, যা আবূ দাউদের বর্ণনানুসারে মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলক্বামা আবূ সালামাহ থেকে আবূ হুরায়রার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে:

افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

"ইয়াহুদী সম্প্রদায় একাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছে। আর নাছারা সম্প্রদায় বাহাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে"। সহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৫৯৬, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৯১। এই দলীয় বিভাজন মুসলিমদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। আর তাদের ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ স্বীয় মহা গ্রন্থে বলেন,

وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ

“তোমরা আপসে ঝগড়া বিবাদ করো না, তাহলে তোমরা অকেজো হয়ে পড়বে”। সূরা আল আনফাল ৮:৪৬। আর ইহুদীদের ব্যাপারে বলেছেন,

تَحۡسَبُهُمۡ جَمِيعٗا وَقُلُوبُهُمۡ شَتَّىٰۚ

“আপনি তাদের সকলকে জোটবদ্ধ দেখলেও তাদের অন্তর বিভক্ত”। সূরা আল হাশর ৫৯:১৪। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ

“তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো, আল্লাহর রজ্জু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না”। সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ إِنَّمَآ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ

“নিশ্চয় যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করে দলে দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, আপনার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারে সকল সিদ্ধান্ত আল্লাহই গ্রহণ করবেন”। সূরা আল আন‘আম ৬:১৫৯।

এই দলগুলোর প্রত্যেকেই স্বীয় আমীরকে মহাসম্মান প্রদর্শন করে এবং তাদের দলের দিকে আহবান করার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর ইসলামের পথে দাওয়াত দেওয়াকে পরিত্যাগ করে। বরং তাদের দলগুলোকে যে পরিত্যাগ করে, তার বিরুদ্ধে তারা প্রচণ্ডরূপে রাগান্বিত হয়ে যায়। আর তাকে বিভিন্ন বিরক্তিকর উপাধি দ্বারা ডাকতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় দীনকে অবশ্যই সমুন্নত করবেন এবং স্বীয় দীনকেই সাহায্য করবেন।

সুতরাং আমি প্রত্যেক ভাইকে এই মর্মে উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং প্রত্যেক মুসলিমের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ

“তোমাদের একমাত্র বন্ধু আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং ঐ সকল ঈমানদার, যারা সালাত কায়েম করে এবং বিনয়াবনত হয়ে যাকাত প্রদান করে”। সূরা আল মায়িদা ৫:৫৫।

এই দলগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। সেই বিষয়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, তুমি দেখবে, তাদের দলের কোনো একজন যুবক উত্তেজিত হয়ে মিম্বার প্রকম্পিত করে মানুষকে তার দলের দিকে আহবান করছে। আর কিছুদিন পরে তুমি জানতে পারবে, সে এই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরেকটি দলে যোগদান করেছে এবং পূর্বের দলটির সমালোচনা করছে। অথবা সে নিজেই একটি দল তৈরি করেছে। এটাই হলো প্রকৃত দলীল যে, এই দলগুলো আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেনি। আর এই মতানৈক্য সৃষ্টির ফলে দলগুলো আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রসূল এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে পারে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট মতানৈক্যের থেকে আরোগ্য লাভের চিকিৎসা নাযিল করেছেন। তিনি বলেন,

وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ

"তোমরা মতানৈক্যে লিপ্ত হও এমন যেকোনো বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল্লাহর নিকটে আছে"। সূরা আশ শূরা ৪২:১০। তিনি আরো বলেন,

فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ

"যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও, তাহলে সেই বিষয়ের সিদ্ধান্ত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট সমর্পণ করো। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে থাক"। সূরা আন নিসা ৪:৫৯।

আর নেতৃত্বের বিষয়ে বিধান হলো, যেহেতু তাদের মূলভিত্তিই বাতিল, বিধায় শাখাগত বিধানও (নেতৃত্বের বিষয়টি) বাতিল বিবেচিত হবে। আর নেতৃত্ব সফরের মাঝে সাব্যস্ত হয় এবং খলীফার জন্যও সাব্যস্ত হয়। আর আমরা তো নৈরাজ্যের দিকে আহবান করছি না। বরং আমরা নৈরাজ্যের কারণে ব্যথিত হই। আমরা শাসন ব্যবস্থার অবসানও চাই না। বরং কিতাব ও সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বর্জনের কারণে আমরা দুঃখিত হই। কিন্তু তারা কীভাবে কাজ করছে? মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহা গ্রন্থে বলেন,

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"যদি তোমরা না জান, তাহলে আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করো"। সূরা আন নাহল ১৬:৪৩।

আর প্রত্যেক শাস্ত্রেই সমাধানের জন্য শাস্ত্রবিদের নিকট শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ আছে। উদাহরণস্বরূপঃ রণবিদ্যার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হবে, যে উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ বিন ওয়ালীদ ও আমর বিন আস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে নেতৃত্বভার অর্পণ করতেন অথচ তাদের চেয়েও যোগ্য নেতৃত্ববান ব্যক্তি মুসলিমদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। এমনকি ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ সহীহ বুখারীতে এই শিরোনামে অধ্যায় রচনা করে বলেছেন,

بَابُ إِمَارَةِ الْمَفْضُوْلِ عَلَى الْفَاضِلِ

"অধ্যায়ঃ নেতৃত্বভার অর্পণের ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম যোগ্য ব্যক্তিকে অধিক যোগ্য ব্যক্তির উপরে প্রাধান্য দেওয়া" ।

সুতরাং যুদ্ধের নেতৃত্বভার ঐ ব্যক্তির উপরেই সমর্পিত করা হবে, যে তা পরিচালনার যোগ্যতা রাখে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণকামী হয়।

আর ঐ ব্যক্তির ফতোয়াই গ্রহণযোগ্য হবে, যে ফতোয়া দেওয়ার উপযুক্ত। সুতরাং জাগতিক অভিজ্ঞতাসমূহকে এই ক্ষেত্রে অকার্যকর মনে করা উচিত হবে না। মহান আল্লাহ স্বীয় মহাগ্রন্থে বলেন,

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

"সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে তোমরা সহযোগিতা করো। অসৎকর্ম ও শত্রুতার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করো না"। সূরা আল মায়িদা ৫:২।

আর মুসলিমদের সংশোধন হবে না ও তাদের রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই কাজটি না করবেঃ উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার উপযুক্ত কর্মে নিয়োগদান করা।

কিন্তু ইখওয়ানুল মুসলিমীন দলটি যখন কোনো ব্যক্তি তাদের সঙ্গ দেয়, তার মহত্বকে অত্যধিক পরিমাণে সমুন্নত করে- যদিও তার মর্যাদা গোবর সমানও না হয়। অপরদিকে তারা আল্লাহর পথে আহবানকারী প্রভাব বিস্তারকারী সুমহান আলেমের মর্যাদা খাটো করে রাখে এবং তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। তাহলে তারা কি আল্লাহর পথে আহবানকারী?

আমি বলি, তারা আল্লাহর পথে আহবানকারী নয়। আমি এই বিষয়টি অস্বীকার করি না যে, তাদের মাঝে কোনো বড় আলেম নেই। বড় আলেম আছে, তবে তার কোনো কার্যকরী ক্ষমতা ও শক্তি নেই। তার হাতে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার নেই।

প্রশ্ন ১৩: এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে বর্তমান সময়ের ইসলামী ফিরকাগুলোর মাঝে প্রচলিত বায়আতগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এগুলো বিদআতে পরিপূর্ণ। শরীআহ বহির্ভূত বায়আত। চাই এগুলোকে বায়আত, আহাদ অথবা আকদ যাই বলা হোক না কেন। তাহলে এখন প্রশ্ন হলো- বায়আত গ্রহণকারী ব্যক্তিদেরকে কি বিদআত পূর্ণ বায়আতের কারণে বিদআতী বলা জায়েয হবে?

জবাব: এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই – উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকটে এই কথাটি পৌঁছে দেয় – যে, যারা সহকর্মীদের উপরে বায়আত করাকে বাধ্যতামূলক সাব্যস্ত করে, তারা সম্পূর্ণ বিদআতপন্থী বলে বিবেচিত হবে। যেহেতু বায়আতের এই রীতিটা সাহাবা, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈন এর যুগে ছিল না। ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া ফাসেক্ব ছিল। কিন্তু তারা (সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন) কি বলেছেন? আমরা অন্য কারোর হাতে নতুন করে বায়আত গ্রহণ করব।

যদিও সামান্য কিছু অর্জিত হয়েও যায়, তবুও সেটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী বহির্ভূত:

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ

"তোমাদের শাসনব্যবস্থা একতাবদ্ধ থাকাবস্থায় তোমাদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে যদি কেউ তোমাদের নিকট আসে, তাহলে তাকে হত্যা কর"। সহীহ মুসলিম হা/১৮৫২।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী বহির্ভূত:

إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

"যখন দুইজন খলীফার বায়আত গ্রহণ করা হয়, তখন দ্বিতীয়জনকে হত্যা করে দাও"। সহীহ মুসলিম হা/১৮৫৩।

তাছাড়া এই বায়আতগুলোর কোনো স্বার্থকতা নেই। বরং এগুলো আত্মসাৎ ও টাকা-পয়সার বায়আত ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যথায় বায়আত গ্রহণকারীর পক্ষে এটা সম্ভব হতো না যে, সে একজনের নিকট বায়আত গ্রহণ করবে। এরপরে আরেক জনের নিকট আরো মোটা অঙ্কের অর্থ পেলে তার নিকটে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। বিশেষত আমাদের এখানে ইয়েমেনে অর্থের আধিক্যতার দিকে লক্ষ্য করে

বায়আত গ্রহণ করা হয়। যার নিকট যত বেশী অর্থ, তার সাথে তত বেশী মানুষ চলে।

আর বায়আত সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করাটা সঠিক নয়। কারণ, এই দলীলগুলোকে অনুপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করা হয়। কেননা এখানে মুসলিমদের ইমামের (নেতার) নিকট বায়আতের কথা বলা হয়েছে। হে ভাই! যখন তুমি মিসরে গমন করবে, সেখানে দেখতে পাবে এমন অনেক তিনজন ব্যক্তির দল আছে, যাদের একজন করে আমীরুল মুমিনীন আছে। আবার কখনো আমাদের ভাই উসামার বক্তব্যানুসারে – যেমনটি আমি শুনেছি – জেলখানার কুঠুরীতে তুমি তাদেরকে দেখবে তারা দিশেহারা অবস্থায় থাকাকালে একজন দাঁড়িয়ে যায় এবং সংবাদ পাঠ করতে থাকে। জেলখানায় থাকা অবস্থায় অন্ধকার কুঠুরীতে বসে সংবাদ পাঠ করতে থাকে! সুতরাং হে আমাদের ভাইগণ! জেনে রাখো, মুর্খতাই তাদেরকে এই পরিণতিতে নিয়ে এসেছে। আর যে কেউ এমন বায়আতের পক্ষে মত পোষণ করবে, সে অবশ্যই ভুলকারী বলে বিবেচিত হবে। এভাবেই দলগুলোর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আর ভিন্ন ভিন্ন মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ

“নিশ্চয় যারা নিজেদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। নিশ্চয় তাদের ব্যাপারে প্রকৃত সিদ্ধান্ত আল্লাহর নিকটেই আছে” (আল আনআম ৬:১৫৯)। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ

“নিশ্চয় আল্লাহর হাত জামাআতের সাথে আছে”। তিনি আরো বলেছেন,

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

“যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে জাহিলী যুগের ন্যায় মৃত্যুবরণ করবে”। আরো বলেছেন,

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِمَامٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ

“যদি তাদের কোনো ইমাম ও জামাআত না থাকে”।

কিন্তু তারা এখন আমাদেরকে শতদলে বিভক্ত করে দিয়েছে এবং নিজেরাও শতদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। আর প্রত্যেক দল নিজ নিজ দলের নামকে সমুন্নত করছে। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

প্রশ্ন ১৪: যখন আমীর তার ব্যক্তিগত কোনো বিষয় বাস্তবায়নের আদেশ জারি করেন যেমন পোশাক ধৌত করা, তার বাহনের লাগাম ধরে রাখা ইত্যাদি যেসকল বিষয় তার ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে জড়িত। তখন কি তার আনুগত্য করা ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব?

জবাব: আমরা জানি না আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এমন আদেশ দিয়েছেন কি-না। কিন্তু আমীর যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যস্ত থাকেন, তখন নিরাপত্তারক্ষী ও তাদের সহযোগী বাহিনীর জন্য আমীরকে এই জাতীয় বিষয়গুলো থেকে মুক্ত করে দেওয়া উচিত।

তবে ওয়াজিব হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে বললে বলা যায় যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন যুদ্ধে গমন করতেন। কিন্তু আমরা এমন কোনো তথ্য পাইনি যে, তিনি সাহাবীগণের উপরে তাঁর পোশাক ধৌত করাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। অথবা তাঁর ব্যক্তিগত কোনো কাজ করতে সাহাবীগণকে বাধ্য করেছেন। প্রত্যেকের মাঝেই এমন কিছু কার্যক্ষমতা ও পরিশ্রমের সক্ষমতা থাকে, যা অন্যরা করতে সক্ষম হয় না।

প্রশ্ন ১৫: এই হাদীসটির অর্থ কী: "যে ব্যক্তি বায়আত না করে মৃত্যুবরণ করল সে জাহিলী যুগের ন্যায় মৃত্যুবরণ করল"?

জবাব: হাদীসটিতে যেই বায়আতের কথা বলা হয়েছে, তা হলো মুসলিমদের শাসকের বায়আত। আর বর্তমান যুগে মুসলিমদের কোনো নেতা বা শাসক পাওয়া যায় না। বরং সাধারণ শাসক পাওয়া যায়, যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন প্রতিযোগিতা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাঝে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপরে নাযিলকৃত স্পষ্ট দলীলের আলোকে কোনো প্রকাশ্য কুফরী না দেখতে পাব, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আনুগত্য ও বশ্যতা মেনে নিব, মুসলিমদেরকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে বাঁচানোর স্বার্থে। অন্যথায় বর্তমানে মুসলিমগণের কোনো শাসক বা নেতা পাওয়া যায় না।

অনেক মানুষ এমন আছে, যারা শাসকদের ব্যাপারে অতি ভক্তি করে তাকে মুজাদ্দিদ মনে করতে থাকে। এমন মানুষকে বলা হবে: সে কোন বিষয়ের মুজাদ্দিদ? যদি সে পথভ্রষ্টতার মুজাদ্দিদ হয়, তাহলে তুমি সত্যবাদী। তবে সে ইসলামের মুজাদ্দিদ তো অবশ্যই না।

আর যখন মুসলিমদের কোনো শাসক পাওয়া যাবে — ইনশা আল্লাহ — তার বায়আত গ্রহণ করা হবে। আর যখন কোনো মুসলিম শাসক বায়আতের দাবি করে, তাহলে তার পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টতার ভয় থাকলে তুমি তার হাতে বায়আত গ্রহণ করতে পারবে। তবে তুমি নিজ উদ্যোগে কোনো শাসকের নিকট যেয়ে বলবে, আমি আপনার হাতে বায়আত নিতে চাই। এমন ক্ষেত্রে আমরা তাদের হাতে বায়আত গ্রহণ করার পূর্বে তাদেরকে প্রশ্ন করব: আল্লাহর নামে শপথ করে জানতে চাই তুমি আমেরিকার আজ্ঞাধীন কর্মচারী কি-না? যদি তোমরা আমেরিকার আজ্ঞাবহ (আদর্শিক অথবা সরাসরি) হও, তাহলে তোমাদের নিকট বায়আত গ্রহণ করা সহীহ হবে না। যেহেতু বায়আত একমাত্র মুসলিমদের শাসকেরই প্রাপ্য।

কখনো কখনো মিসরে দেখা যায় যে, প্রতি তিন জনের একজন করে আমীর আছে। সুতরাং ইখওয়ানুল মুসলিমীন এর কাছে কৃত বায়আতও বিদআত। এই মোড়কবদ্ধ দল ও গ্রুপগুলোর কর্মীদের নিকট বায়আত গ্রহণ করা নিশ্চিত বিদআত। এমনিভাবে কোনো দলের হাতে বায়আত গ্রহণ করাও বিদআত। যেমন: তাবলীগ জামাআতের নিকট বায়আত গ্রহণ। আর এই দল ও গ্রুপগুলো কিছু মানুষের হাতে আমেরিকার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করে রেখেছে। যা মুসলিমদেরকে দুর্বল করে দিচ্ছে। তাদের ঐক্য বিনষ্ট করে দিচ্ছে। তাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করছে। যার ফলে তারা বিভিন্ন মতে ও দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে।

বাকি থাকল এই বিষয়ের বিধান যে, কোনো দাঁড়ি ও পাগড়ি পরিহিত এবং পায়ের অর্ধনলা পর্যন্ত পোশাক পরিধানকারী এসে তোমাকে বলে, শায়েখ, আপনি বায়আত গ্রহণ করেন। অমুক শায়েখ অনুমতি দিয়েছেন। আর তুমি প্রকৃত ঘটনা না বুঝেই বায়আত গ্রহণের জন্য রওনা দিলে। তাহলে এই ক্ষেত্রে বিধান কী? বিধান হলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মাঝে কোনো নতুন বিধান সংযোজন করল, তার সংযোজিত বিধানটি বর্জিত হবে"। সহীহ মুসলিম হা/১৭১৮। যেহেতু বায়আত গ্রহণকারী শপথ করেছে। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

"যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ করার পরে যদি উক্ত শপথকৃত বিষয়ের চেয়ে উত্তম কোনো বিষয় পেয়ে যায়, তাহলে সে যেন উত্তম বিষয়টি সম্পাদন করে এবং তার শপথের কাফফারা আদায় করে দেয়"। সহীহ মুসলিম হা/১৬৫০।

আর পরাজয়বাদী দলগুলো যখন মানুষকে বলতে দেখল: এমন বায়আত সহীহ নয়। তখন তারা বলতে শুরু করল: এটা আহাদ বা অঙ্গীকার, আমরা আসলে অঙ্গীকার নিচ্ছি, বায়আত নিচ্ছি না। আর অঙ্গীকারের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে যেমনটি পূর্বে বলা হলো।

আর এই বিচ্ছিন্ন দলগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি রিসালাহ লিখে ফেলতে হবে। যাতে করে বুঝা যায় যে, ইউসূফ কারযাভী, আব্দুল ওয়াহহাব দায়লামী, সালাহ আস সাবী ও উক্কাইল মাক্তত্বরীসহ যারা একাধিক দলীয় সংগঠন এর বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন, তারা আসলে মরীচিকার পথে আহবান করছেন। বিধায় এমন একটি রিসালাহ লিখা কিছু তালিবুল ইলম এর জন্য অতীব জরুরী একটি দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার দ্বারা এই সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ও কুরআনের আয়াতসমূহ একত্রিত করবে। যার ফলে এই দলের কর্মীরা বুঝতে সক্ষম হবে যে, তারা কোন অবস্থার উপরে আছে।

আর সালাহ সাবী হলো সাঈদ হাওয়ার খলীফা। হে সালাহ সাবী! আপনি অচিরেই মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনার কিতাবসমূহ ও দর্শনসমূহ মৃত্যুবরণ করবে। যেভাবে সাঈদ হাওয়া মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তার কিতাবসমূহ ও চিন্তা দর্শন মৃত্যুবরণ করেছে। আমি যখন মিসরে অবতরণ করেছি, তখন থেকেই আপনাকে আমি একজন সৎ ব্যক্তি হিসেবে চিনি। বিধায় আপনাকে এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা থেকে আমি সাবধান করছি। আপনি কেন মুসলিমদের পার্থক্য ও তাদের ঐক্য বিচ্ছিন্ন করার পথে আহবান করছেন। যার মাধ্যমে আপনি আসলে আমেরিকারই নীলনকশা বাস্তবায়ন করছেন। কারণ, তারা চায় আমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে থাকি।

মুসলিমদের শাসকগণ সকলেই আল্লাহর পথে আহবানকারী দাঈদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে থাকে। আবার কখনো তারা আমাদেরকে নজরদারি করার জন্য গোয়েন্দাও প্রেরণ করে। যাদের শরীর পায়ের নলা পর্যন্ত পরিহিত পোশাক দ্বারা আবৃত। আবার কখনো তারা বাহরাইনে অভিযান পরিচালনা করে। কখনো বা দাম্মামে। কখনো বা খারজে। তারা আসলে আসে মুসলিমদের দলে মতবিরোধ সৃষ্টি করার স্বার্থে।

তবে আহলুস সুন্নাহ মতানৈক্যের দিকে আহবান করে না। যদি কোনো ব্যক্তি বলে, তোমরা ইয়েমেনে বিভিন্ন দলে বিভক্ত। তাহলে আমরা বলব, আমাদের

দাবি স্পষ্ট। আমরা মুসলিমদেরকে ঐক্যের দিকে আহবান করছি আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের পতাকার অধীনে।

অবশেষে বিষয়টি এতদূর পর্যন্ত গড়াল যে, ইখওয়ানুল মুসলিমীন এর চারজন আলেম ও আহলুস সুন্নাহ এর চারজন আলেমকে তলব করা হলো। আর সিদ্ধান্ত হলো যে, আলেমগণ যেই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, তাই হবে স্বীকৃত ও গ্রহণীয়। আর আমাদের সকলের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত ততক্ষণ পর্যন্ত শাসকের নিকট যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আলেমগণ সেটাকে স্বীকৃতি না দিবেন। তখন ইখওয়ানুল মুসলিমীন এই বিষয়টিতে সম্মতি দিল না। কারণ, তারা কোন দলীল দ্বারা ডেমোক্রেসির পক্ষে ও প্রতিপক্ষের মতকে সম্মান করার পক্ষে দলীল পেশ করবে। কোন দলীল দ্বারা জাতি সংঘের সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি সমর্থন জানাবে। আর কোন দলীল দ্বারা নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তগুলোকে স্বীকৃতি দিবে।

আর আমরা তো আমাদের ইয়েমেনী ভাইদেরকে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতেরসুন্নাতের আলোকে সকল মুসলিমের ঐক্যের পথে আসার প্রতি আহবান করি। আমরা তাদেরকে বলেছি, যখন শাসন বা ক্ষমতার ব্যাপার আসবে, তখন ক্ষমতার চেয়ার তোমাদেরই থাকবে। আমাদেরকে আমাদের পথে ছেড়ে দিবে। আমরা দারসের দায়ভার নিয়ে থাকব আর একে অপরকে কিতাব ও সুন্নাতেরসুন্নাতের সীমায় থেকে ভালো কর্মে সহযোগিতা করব। আর আমরা আমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান নির্ণয়ে কিতাব ও সুন্নাতেরসুন্নাতের কাছে আমাদের সমস্যাগুলোকে সমর্পণ করব।

তারা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত থাকে। আর তা ঘটেছে এবং বিভিন্ন পত্রিকা তা প্রচার করেছে এবং বাথ পার্টির সঙ্গে সমন্বয়ের জন্যও তারা প্রস্তুত আর তা তাদের মাঝে সংগঠিত হয়েছে। তারা সুফীবাদী ও শীআদের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু হে আহলুস সুন্নাহ এর অনুসারীরা! তোমরা আমাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক বড় বাঁধা। এমনকি হুদায়দা প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক প্রধান পরিচালক বলেছেন, যদি আমার কোনো সমস্যা হয়, তাহলে কমিউনিস্টদের পূর্বে তোমাদেরকে পাকড়াও করব। যখন আমাদের ভাই আব্দুল্লাহ বিন হিবাহ তাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন, হে আমার ভাই! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। কীভাবে আপনি আমাদের ভাইদেরকে প্রহার করছেন। তখন তিনি উক্ত ধমক প্রদান করেন।

প্রশ্ন ১৬: আমাদের এক যুবক ভাই আছেন, যিনি সুন্নাতের প্রতি অধিক ভক্তি রাখেন। তিনি ও তার সহযোগিরা মনে করেন যে, প্রত্যেক মাসজিদের জন্যই একজন আমীর নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত। যিনি উক্ত মাসজিদে অনুষ্ঠিত ইলমী মাজলিসগুলোর যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করবেন। আর তারা তার উপরে আমীর শব্দটির প্রয়োগ করবেন। এটা কি দলীলের দৃষ্টিতে জায়েয হবে?

জবাব: এটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সব্যস্ত হয়নি। আর সাহাবীগণ কি এমন কিছু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মাদীনায় করেছেন? আর যদি তিনি এমনটা করেও থাকেন, তথাপি তা জায়েয হবে। যেহেতু তিনি তখন মুমিনদের আমীর ছিলেন। তবে এই যুগে এটা (মাসজিদের জন্য আমীর নির্ধারিত করা) বিদআত ও মুসলিমদের ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করার শামিল হবে।

আর এই ব্যাপারে নিরাপদ পন্থা হলো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ যেভাবে শিক্ষা দিতেন সেভাবে শিক্ষা প্রদান করা। আল্লাহর জন্য নিজ ইচ্ছাকে খাঁটি করা। আর আগমনকারী প্রত্যেক ভাইকেই দীন শিখানো। চাই সে তাবলীগ জামাআতের কোনো ভাই হোক অথবা ইখওয়ানের কোনো ভাই হোক অথবা সুফীবাদে বিশ্বাসী কোনো ভাই হোক। তবে শর্ত হলো যদি তুমি তার ব্যাপারে এই ভয় না পাও যে, সে তোমার ছাত্রদের প্রতি প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। আর যদি সে তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে এই ব্যাপারে তুমি ভয় পেয়ে থাক, তাহলে তাকে পরিহার করে চলো।

সুতরাং একজন শিক্ষক তার ছাত্রদের মান অনুসারে তার দারসকে উপস্থাপন করবেন। আমি কোনো নৈরাজ্য বা অরাজকতার পক্ষে বলছি না। আর আমাদের দারস – আলহামদু লিল্লাহ – আমীরুল মুমিনীন ও তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও আশানুরূপ সর্বোত্তম দারস। আমি বলব, এই বিদআতগুলো মুসলিমদের ইলম এর বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটি কার্যকারণে পরিণত হয়েছে।

আমরা আল্লাহর জন্য শিক্ষা দান করি। যেভাবে ইমাম মালেক শিক্ষা দিতেন। এমনিভাবে ইমাম আহমাদও শিক্ষা দিতেন। একইভাবে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব শিক্ষা দিতেন। যেভাবে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক শিক্ষা দিতেন। যেভাবে ইমাম শাফে‘ঈ শিক্ষা দিতেন। যেভাবে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যা, ইবনুল ক্বায়্যিম ও হাফিয ইবনু হাজার শিক্ষা দিয়েছেন। যা ধারাবাহিকভাবে আমাদের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এরপরে এই বিদআতগুলো ইসলামের শত্রুদের অনুকরণে চালু করা হয়েছে।

তাহলে ইমাম মালেকের মাজলিসের ইমাম কে ছিলেন? আর যদি এমন কাউকে ইমাম মালেক খুঁজে পেতেন, তাহলে তাকে তিনি দরজা থেকে বের করে দিতেন। এমনিভাবে ইমাম আহমাদও এমনটিই করতেন। খলীফা রশীদ ইমাম মালেকের নিকট তাকে, তার সন্তানদেরকে একান্তে মুওয়াত্ত্বা কিতাব দারস দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। তখন তিনি বলেন, আমার পক্ষে কাউকে বিশেষভাবে ইলম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তখন তিনি বললেন, তাহলে আমি আপনার মাজলিসে উপস্থিত হব আর আপনি আমাকে পড়ার সুযোগ দিবেন। অথবা আপনিই পড়বেন। তখন তিনি বললেন, আমি এক যুগ পর্যন্ত পড়িনি। বরং তুমি পড় হে মা'ন বিন 'ঈসা। আর মা'ন বিন 'ঈসা পড়তে থাকলেন আর রশীদ মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকলেন।

এমনিভাবে আমীর খালিদ ইমাম বুখারীর যুগে তার নিকট দাবি জানালেন যে, সহীহ বুখারী ও আত তারীখ গ্রন্থটি পাঠ করার জন্য। তখন বুখারী রহিমাহুল্লাহ বললেন, আপনি একজন আমীর। আর আমার পক্ষে কাউকে বিশেষভাবে 'ইলম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। যখন কাউকে বিশেষভাবে 'ইলম শিক্ষা দেওয়া হবে, তখন 'ইলমের বরকত নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি আপনি আমাকে বাঁধা দিতে চান, তাহলে বাঁধা দিতে পারেন। তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার আপত্তি গ্রহণীয় হবে। এরপরে আমীর খালিদ তার বিপক্ষে অনেকগুলো মূর্খ ফক্বীহকে চাপিয়ে দিলেন। যারা ইমাম বুখারীকে কষ্ট দিতে থাকল। অবশেষে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনার যমীন প্রশস্ত হওয়ার পরেও তা আমার জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছে। বিধায় আমাকে আপনার নিকট তুলে নিন।

প্রশ্ন ১৭: শারঈ ইমারত কী? কখন এটা জায়েয হবে আর কখন এটা জায়েয হবে না?

জবাব: শারঈ ইমারত প্রতিষ্ঠা করা মুসলিম জাতির শাসকের দায়িত্ব। যখন মুসলিম জাতির কোনো শাসক পাওয়া যাবে, তখন তার অধীনস্ত রাষ্ট্রই হবে শারঈ ইমারত। আর যাকে মুসলিম জাতির শাসক মিসরের আমীর বানাবে, অথবা ইয়েমেনের আমীর বানাবে অথবা সুদানের আমীর বানাবে অথবা লিবিয়ার আমীর বানাবে তখন এটাই হবে শারঈ ইমারত। অচিরেই তা শারঈ ইমারত প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

আর সফরের নেতৃত্বের ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»

“যখন তিনজন ব্যক্তি সফরে বের হবে, তখন তারা যেনো একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়” । সহীহ: সুনানে আবূ দাউদ হা/২৬০৮ ।

সুতরাং তাবলীগ জামাআতের আমীর বিদআতের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আমীর বিদআতের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এমনিভাবে যেই জামাআত মুসলিমদের শাসক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির নেতৃত্বে চলে, তা বিদআতের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন ১৮: এই দলগুলোর সাথে বায়আত গ্রহণ করার বিধান কী এবং ইসলামে বায়আত কখন জায়েয হয়?

জবাব: এই দলগুলোর নিকট বায়আত গ্রহণ করা বিদআত বলে বিবেচিত হবে। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে বায়আত শুধুমাত্র নাবীর জন্যই নির্ধারিত ছিল। তিনি সাহাবাগণের কাছ থেকে বায়আত নিতেন মান্য করা ও আনুগত্য করার পক্ষে।

সহীহাইনে উবাদাহ বিন সামিত রদ্বীয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ .

“আমরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বায়আত করেছি এই মর্মে যে, “আমরা দরিদ্রতা ও স্বচ্ছলতা, সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আপনার কথা শুনবো ও আনুগত্য করবো” । আর আমরা “ কোনো আমীরের সাথে তার দায়িত্বের ব্যাপারে কোনো ঝগড়া বিবাদ করব না” । তবে যদি তার থেকে এমন কোনো বিষয় সংঘটিত হয়, যাতে তোমরা স্পষ্ট কুফর আছে বলে নিশ্চিত হতে পার। যেই বিষয়ের বিপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত স্পষ্ট দলীল তোমাদের কাছে বিদ্যমান থাকে” । সহীহ মুসলিম হা/১৭০৯ ।

সহীহাইনে জারীর বিন আব্দিল্লাহ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

“আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বায়আত করেছি সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং প্রত্যেক মুসলিম ভাইকে সদুপদেশ দেওয়ার ব্যাপারে” । সহীহ বুখারী হা/৬৭ ।

আবার কখনো কখনো তিনি "তারা যেনো পলায়ন না করে" এই মর্মেও বায়আত নিয়েছেন। আবার কখনো মৃত্যুর উপরেও বায়আত গ্রহণ করেছেন। কখনো মহিলাদের থেকেও বায়আত গ্রহণ করেছেন। আবার কখনো কোনো কোনো ব্যক্তি থেকে এই মর্মে বায়আত নিয়েছেন যে, "সে যেনো কারোর নিকট কোনো বস্তু প্রার্থনা না করে"। এমনিভাবে তাঁর পরবর্তী সাহাবীগণ আবূ বকর, উমার ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বায়আত গ্রহণ করেছেন।

আর আজকে মুসলিমরা ইসলামের শত্রুদের অনুকরণ করছে। তারা বায়আতকে ছুঁড়ে ফেলছে। আর ইসলামের শত্রুদের অনুকরণে ভোট প্রদান করছে ও তাগূতী পদ্ধতির আলোকে নির্বাচন এর পথে হাঁটছে।

সুতরাং এই বিষয়টি থেকে স্পষ্টরূপে জানা গেল যে, এমন বায়আত গ্রহণ করা জায়েয নেই। কিন্তু যদি আমীর সুন্নাহ এর অনুসারী হন এবং তার শক্তিশালী প্রভাব থাকে। আর মানুষও তাকে সমীহ করে, তাহলে বায়আতের আহবান করাতে কোনো সমস্যা নেই এবং মানুষের জন্য তার হাতে কিতাব ও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ অনুসারে বায়আত গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই। তবে প্রত্যেকটি জামাআতই তার দলের পক্ষে যেই বায়আত করার জন্য আহবান করে, তা মূলত বিচ্ছিন্নতা। আর এটা প্রথম থেকেই ব্যর্থতা ও অকার্যকারিতার পরিণাম:

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

"তোমরা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করো না, তাহলে তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়বে"। সূরা আল আনফাল ৮:৪৬।

প্রশ্ন ১৯: আপনি বলেছেন এমনও সংগঠন আছে যা শারঈ বিধি অনুসারে পরিচালিত হয়। এই ক্ষেত্রে সঠিক সংগঠন নির্বাচনের মূলনীতি কী?

জবাব: এইক্ষেত্রে মূলনীতি হলো সংগঠনটি যেন শরীআতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

'তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার চোখের হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার মেহমানের হক আছে।' সহীহ বুখারী হা/৬১৩৪।

আরেকটি উদাহরণ হলো: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোচ্চ গোপনীয়তার সাথে সেনা বাহিনী নিয়ে সর্বোচ্চ শৃঙ্খলার সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে বের হতেন। এমনকি কখনো তিনি অল্প সময়ের মধ্যে বহু দূরত্বের স্থানকে অতিক্রম করতেন। যেহেতু তারা সকলেই শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতেন। পক্ষান্তরে বিশৃঙ্খলাবদ্ধ সংগঠনের অবস্থা এর বিপরীত। এইক্ষেত্রে এমনও হওয়া সম্ভব যে, একই স্থান থেকে একত্রে নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যানবাহনে রওনা দেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ তিন ঘণ্টার দূরত্বটিকে পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত বিলম্বিত করবে। অথচ তারা একই স্থান থেকে রওনা দিবে এবং সাত ঘণ্টা পরিমাণ সময় ব্যয় করবে। একজন বলবে, আমি নাস্তা করিনি। আমার নাস্তা করা দরকার। অপরজন বলবে, আমি পানি খাওয়ার জন্য একটু যাত্রা বিরতি করব। এমনিভাবে একজন এই অজুহাত দিবে। অপরজন ঐ অজুহাত দিবে। ফলে তারা বিশৃঙ্খলার কারণে গন্তব্যে পৌঁছতে দেরী করবে। সুতরাং দাওয়াতের সংগঠন এমন নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, যা দীনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। তবে জিহাদ ও অন্যান্যক্ষেত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধতা একটি জরূরী বিষয়। আর সুন্নাহসম্মত শারঈ সংগঠনকে অস্বীকার করা যায় না।

তবে এমন সংগঠন, যা তোমার সময়কে নষ্ট করে দেয়। তুমি কুরআন হিফয করেছ আর তোমার সংগঠন তোমাকে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হতে এবং তোমার দাঁড়ি মুণ্ডন করতে বাধ্য করে। এমন সংগঠন বিদআতে পরিপূর্ণ। হে আমার ভাই! তুমি দাঁড়ি মুণ্ডন করছ সেনাদলের সারিভুক্ত হওয়া এবং তোমার মতের দিকে আহবান করার উদ্দেশ্যে। তাহলে এটা নিশ্চিত যে, তা তাগূতী সংগঠন। তুমি কিতাব ও সুন্নাতের উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছ আর তোমার সংগঠন তোমার হৃদয়কে নেতৃবর্গের তাগূতী মাজলিসে অংশগ্রহণের জন্য উদার করতে বাধ্য করছে, যা ভোট প্রদানের ভিত্তিতে পরিচালিত। এটা তাগূতী ব্যবস্থা।

সুতরাং এমন সংগঠন, যা আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ বিরোধী, তা অবশ্যই তাগূতী সংগঠন। তবে যেই সংগঠন কিতাব ও সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, এমন সংগঠনে দ্রুত আত্মনিয়োগ করো। যা নৈরাজ্য বা অরাজকতার পথে আহবান করে না। যদিও উক্ত সংগঠনে এমন ব্যক্তি থাকে, যে নৈরাজ্যের পথে আহবান করলে মুসলিমগণ তাকে গুরুত্ব দিবে না।

প্রশ্ন ২০: কেন বায়আত একমাত্র কুরাইশী ইমাম ব্যতীত অন্য কারোর নিকট গ্রহণ করা যাবে না? এই বিষয়ের দলীল কী এবং কীভাবে তা সাব্যস্ত হয়?

জবাব: যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

"শাসকদেরকে মনোনীত করা হবে **কুরাইশ** বংশ থেকে" । তিনি আরো বলেছেন,

لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ

"যতক্ষণ পর্যন্ত **কুরাইশ**দের দুইজন ব্যক্তিও অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শাসনকার্যের এই দায়িত্ব **কুরাইশ** বংশের অধীনে থাকবে"। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

الْخِلاَفَةُ فِي قُرَيْشٍ

"খিলাফতের দায়িত্ব **কুরাইশ** বংশের অধিকারে থাকবে"।

সুতরাং যদি কেউ বলপূর্বক এই অধিকার **কুরাইশ**ীদের থেকে ছিনিয়ে নেয়, তাহলে সে জবরদখলকারী বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যখন তার ক্ষমতা শক্তিশালী হয়ে যাবে, তখন তার আনুগত্য করা ও মান্য করা ওয়াজিব হয়ে যাবে মুসলিমদের জীবন রক্ষার স্বার্থে যদি উক্ত শাসক মুসলিম হয়। তবে বায়আতের প্রকৃত পদ্ধতি, যেটাকে আমেরিকা ও রাশিয়ার এজেন্টরা নির্বাচন ও ভোট প্রদান পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবর্তন করে ফেলেছে।

বায়আতের প্রকৃত পদ্ধতি হলো ইমাম (শাসক) নেতৃস্থানীয় (জ্ঞান ও ক্ষমতার ভিত্তিতে) ব্যক্তিবর্গের নিকট তাকে "আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার" মর্মে তার নিকট বায়আত গ্রহণ করার দাবি জানাবে।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো স্বীয় সাহাবীগণকে মৃত্যুর উপরেও বায়আত নিতেন। আবার কখনো (যুদ্ধের মাঠ থেকে) পলায়ন না করার মর্মে বায়আত নিতেন। আবার কখনো স্বীয় সাহাবীদের নিকট হতে প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণকামিতার পক্ষে বায়আত নিতেন। আবার কখনো স্বীয় সাহাবীগণ থেকে "শিরক না করা, ব্যভিচার না করা, নিজ সন্তানদেরকে হত্যা না করা, নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে (না জেনে) মিথ্যা অপবাদ না দেওয়ার" মর্মে বায়আত নিতেন। আবার কখনো মহিলাদের থেকে অবিচল থাকার মর্মে বায়আত নিতেন। সুতরাং তিনি বায়আত প্রয়োজন ও সুবিধানুসারে নিতেন।

প্রশ্ন ২১: বায়আত কি গোটা সমাজ সম্মিলিত হয়ে শাসক বাছাই করার নাম নাকি অন্যকোনো বিষয়। যদি অন্যকোনো বিষয় হয় তবে সেটা কী?

জবাব: বায়আত হলো মুসলিম শাসক কর্তৃক মুসলিম সমাজের নিকট তার কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের পক্ষে আনুগত্যের দাবি করা। চাই দাবিটি মান্য করা ও আনুগত্য

করার পক্ষে হোক। যেমনটি জারীর বর্ণিত মুত্তাফাক্বুন আলাইহি হাদীসে বিদ্যমান আছে। অথবা (তার সাথে অবস্থান করে) মৃত্যুর পক্ষে হোক। যেমনটি জাবির অথবা সালামাহ ইবনুল আকওয়া বর্ণিত হাদীসে বর্ণিত পাওয়া যায়। যে হাদীসদ্বয়ের একটিতে মৃত্যুর পক্ষে বায়আত করার কথা বলা হয়েছে। আর অপরটিতে যুদ্ধের ময়দানে পলায়ন না করার পক্ষে বায়আত করার কথা বলা হয়েছে।

তবে অর্থ উভয়টির একই। আর এই অর্থেই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার প্রেক্ষাপটে বায়আত নিয়েছিলেন। অথবা বায়আতটি মানুষের কাছে কোনো বস্তু না চাওয়ার পক্ষে হোক। অথবা বায়আতটি ব্যভিচার ও চুরি পরিত্যাগ করার পক্ষে হোক। যেমনটি উবাদাহ বিন সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মুত্তাফাক্বুন আলাইহি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

“তারা শিরক করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, নিজেদের কর্তৃক বানানো কোনো মিথ্যা অপবাদ অন্যের প্রতি আরোপ করবে না এবং সৎকাজে তাঁর অবাধ্যতা করবে না”। এটাকে বায়‘আতুন নিসা বলা হয়।

আমরা এই বিষয়ে (আল ইলহাদুল খামিনী ফী আরদ্বিল হারামাইন) গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে আলোচনা করেছি যে, বায়আত কুরাইশী ইমামের নিকট করতে হবে। অথবা ঐ ব্যক্তির নিকট যে শাসনকার্য জবরদখল করেছে। আর এটা অধিক উত্তম, অধিক উত্তম এবং অধিক উত্তম, তাগূতী নির্বাচনী পদ্ধতি থেকে।

আর শাসক পুরুষদের ও নারীদের নিকট হতে বায়আত নিবে যদি সে এটাকে পছন্দ করে। যেহেতু জামে আত তিরমিযীসহ অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলাগণ তাদের হাত প্রসারিত করে দিলেন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বায়আত গ্রহণ করার জন্য। তখন তিনি বললেন,

إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ، كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ " قَالَتْ: " وَلَمْ يُصَافِحْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا امْرَأَةً .

“আমার একজন মহিলাকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছি একশজন মহিলার জন্যও সেই একই কথা প্রযোজ্য। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাদের সাথে মুসাফা করলেন না”। সহীহ: মুসনাদে আহমাদ।

এটাই হলো সেই প্রকৃত বায়আত। এই বায়আতের মাঝে আর নির্বাচনী পদ্ধতির মাঝে আকাশ পাতাল তফাৎ।

বায়আত হলো: শাসক যেভাবে ভালো মনে করেন, সেভাবেই বায়আতের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন। যেমনটি তুমি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বায়আতগুলোর বৈচিত্রময়তার মাঝে লক্ষ্য করেছ, যেই বায়আতগুলো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়েছেন।

পক্ষান্তরে, নির্বাচনী পদ্ধতি হলো: যেখানে নির্বাচনকারীরাই হলো একমাত্র ব্যক্তিসত্তা, যারা উক্ত পদ্ধতিকে শাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে ইচ্ছেমত প্রয়োগ করতে পারে। যেমনটি দাবি করে থাকে মিথ্যাবাদী গণতান্ত্রিক মতবাদ।

প্রশ্ন ২২: নাবী সাল্লাল্লাহু **আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরবর্তী (খলীফা) প্রতিনিধির ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত না দিয়ে সর্বমহান বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন- এর রহস্য কী?**

জবাব: তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত মুবাল্লিগ। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উক্ত বিষয়ে কোনো আদেশ দেননি। যদি আমাদের সামনে রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে যায়, তাহলে তো সেটা হবেই। অন্যথায় রহস্য তালাশ করা আমাদের জন্য কোনো জরুরী কাজ নয়।

তবে হাদীসে আবূ বকরের স্থলাভিষিক্ততার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন: সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আয়িশাকে বললেন,

ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ، أَبَاكِ، وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ

"তোমার পিতা আর তোমার ভাইকে আমার নিকট ডেকে আনো, যাতে আমি একটি পত্র লিখে যেতে পারি। আমার ভয় হচ্ছে যে, এমন কোনো ক্ষমতালোভী শাসনভার দাবি চেয়ে বসে কি-না, যাকে আল্লাহ ও মুমিনগণ নাকচ করে দেয়"। মুত্তাফাক্বুন আলাইহি, মুসলিম হা/২৩৮৭।

أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تَقُولُ: المَوْتَ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ»

'একদা এক নারী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলে তিনি তাকে পুনরায় আসতে বলেন। তখন উক্ত মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি এসে আপনাকে না পায়? তিনি যেন মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত দিলেন। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি আবূ বকরের কাছে যেয়ো"। সহীহ বুখারী হা/৭২২০।

আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকরকে মানুষের ইমামতি করার আদেশ দিয়েছেন। ফলে সাহাবীগণ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম বলেছেন, তিনি তার প্রতি আমাদের দীনী বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাহলে আমরা কেনো আমাদের দুনিয়াবী বিষয়ে তার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারব না।

প্রশ্ন ২৩: এমনও ব্যক্তি আছেন, যাকে "দলীয়করণে কোনো কল্যাণ নেই" এই কথা বললে সে বলবে, আমরা ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা করে যাচ্ছি। যদি এটা সহীহ হয়, তাহলে এমন আদর্শের উপরে বিভিন্ন দল প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহলে উক্ত দলগুলোর মাঝে কোন দলটি খিলাফতের জন্য প্রকৃতপক্ষে চেষ্টা করছে?

জবাব: ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি এতই গুরুত্ববহ যে, এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পথে আহবানকারী প্রত্যেক দাঈর সবচেয়ে বড় লক্ষ্যগুলোর একটি হওয়া উচিত। মুসলিমদেরকে তাদের বিচ্ছিন্নতা পেছনে ফেলে দিয়েছে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় মহাগ্রন্থে বলেছেন,

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

"তোমরা একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে"। (আল আনফাল ৮:৪৬)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না" (আলে ইমরান ৩:১০৩) ।

তবে জ্ঞানবিমুখ সমাজে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে চেষ্টা করা নিছক পাগলামী বলেই বিবেচিত হবে। আমরা একটি জ্ঞানবিমুখ সমাজে বসবাস করছি। যাদেরকে দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। আর যদি এই দাবিটি বাস্তবিক না হয়, তাহলে হে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী – আপনার কাছে তো এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ – কিন্তু আপনি কি মুসলিমদের আকীদা বিশুদ্ধ করেছেন?

আপনি কি মুসলিমদেরকে তাদের দীনের প্রকৃত শিক্ষা দিয়েছেন? নাকি যেসকল মুসলিমকে আপনি অজ্ঞতার সাগরে ছেড়ে দিয়ে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার

আন্দোলনে নেমেছেন তারাই অচিরে আপনাকে হত্যা করে আল্লাহর নিকট আপনার রক্তের বিনিময়ে সাওয়াবের আশা করবে না তো?

আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই: বর্তমান যুগে মুসল্লিগণ কি পরস্পরের মাঝে ঐক্য বজায় রাখতে পেরেছে? নাকি তারা আল্লাহর পথের দাঈকে ওয়াহহাবী বলে গালি দেয় এবং তাতে মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়ে। আবার কখনো কখনো মাসজিদগুলোতে তারা একে অপরের সাথে হাতাহাতিও করে।

সুতরাং মুসলিমদের জন্য যারা প্রকৃতপক্ষেই গুরুত্বসহ কাজ করতে চায়, তাদের উচিত হলো শুরুতেই মুসলিমদেরকে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা। তাদের আকীদা বিশুদ্ধ করার ব্যবস্থা করা। কারণ, ইসলামী খিলাফত শীআ আকীদার উপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইসলামী খিলাফত ক্বরব-মাজার কেন্দ্রিক আকীদার উপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইসলামী খিলাফত সুফী আকীদার উপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ইসলামী খিলাফত কোনো দলীয় আকীদার উপরে ভিত্তি করেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

বরং আমাদেরকে অবশ্যই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মত ও পথের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথে দাওয়াত প্রদান করার মাধ্যমে তাঁর কর্মধারা শুরু করেছিলেন? নাকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পথে দাওয়াত প্রদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মধারা শুরু করেছিলেন?!!

ভালো কথা। আমার প্রিয় আল্লাহর পথের ভাইবৃন্দ! কিছু মূলবান গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে তাদের এই মতের খণ্ডনে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: আমাদের দীনী ভাই রবী বিন হাদী রচিত মিনহাজুদ দাওয়াহ ইলাল্লাহ। অন্যতম আরেকটি গ্রন্থ হলো: "আল আকীদাতু আওওয়ালান লাও কানু ইয়ালামূন"। গ্রন্থটি আমাদের দীনী ভাই ক্বারী আব্দুল আযীয রচনা করেছেন।

সুতরাং ঐ সকল ব্যক্তি, যাদের উপরে তাদের পাগলামী প্রভাব বিস্তার করেছে। যারা খিলাফত এর দ্বারা দাওয়াত শুরু করতে চায়। অথচ তাদের মাঝে সুফীবাদী, মাজারপন্থী এবং এমন ব্যক্তিও আছে, যারা সঠিকরূপে অযূও করতে জানে না।

তারা খিলাফতের দাওয়াত দ্বারাই শুরু করতে চায়। অপরদিকে তারা আহলুস সুন্নাহ জামাআতের আবির্ভাবকে রুখে দিতে চায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে কখনো তাকে তার ভাইয়ের প্রতি অন্যায় করবে না। সে তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না। তাক্বওয়া এই স্থানে থাকে। কোনো মানুষ খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট

যে, সে তার ভাইকে লাঞ্চিত করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার অপর মুসলিম ভইয়ের রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করা হারাম"।

তারা খিলাফতের দাওয়াত দ্বারা কার্যক্রম শুরু করে। আর ইলমুল হাদীসের বিশেষজ্ঞদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করে। তারা বলে, এটা সহীহ হাদীস বা দ্ব'ঈফ হাদীস বলার সময় নয়। এটা কি আবূ বকরের কাজ?! এটা কি উমারের কাজ?! এটা কি উছমানের কাজ?! এটা কি আবূ তালিবের কাজ?! এটা কি অন্যান্য খলীফার কাজ?

হে আমাদের দীনী ভাইগণ! — আল্লাহ আপনাদেরকে বরকত দান করুন — এটা নিতান্তই বোকামি। যে কোনো বিষয়ে অজ্ঞ থাকে, সে উক্ত বিষয়টির প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। যদি খিলাফতে রাশিদার বিষয়টি তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণই হয়, তাহলে খিলাফতের সূচনা কোথা থেকে হলো?

ইসলামী খিলাফতের সূচনা মাসজিদ থেকে হয়েছে। পুলিশ স্টাফ কলেজ থেকে সূচনা হয়নি। এয়ারফোর্স একাডেমি থেকে হয়নি। অমুক অমুক কলেজ থেকেও হয়নি। বরং মাসজিদ থেকে হয়েছে। যেমনটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।

আসলে আমরা সর্বদাই বিশৃঙ্খল থেকে যাব। আমি সঠিক কথা বলছি। এটা আমরা তাদেরকে কটাক্ষ করে বলছি না। তারা ইসলামী দাওয়াতের প্রতি অবিচার করেছে। আর মুসলিমদের শাসকদেরকে আল্লাহর পথে আহবানকারী দাঈদের বিপক্ষে উস্কে দিয়েছে। যার ফলে তারা মনে করে যে, তারা (দাঈগণ) শুধুমাত্র শাসন ক্ষমতার দাবিদার। না, এটা সঠিক নয়।

আমরা আল্লাহর আহবানকারী। আমরা শাসন ক্ষমতার দাবিদার নই। যদিও কিছু মুসলিম শাসকের কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দূরে থাকার বিষয়টি আমাদেরকে কষ্ট দেয়। কিন্তু আমরা মূলত আল্লাহর পথে আহবানকারী দাঈ।

فَسَبِيْلُ الْخِلَافَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ : اَلدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ، وَالتَّعْلِيْمُ.

সুতরাং ইসলামী খিলাফতের (প্রথম) পথ হলো: আল্লাহর পথে আহবান করা আর দীন শিক্ষা দেওয়া।

প্রশ্ন ২৪: "ইমাম কুরাইশদের মধ্য থেকেই নির্ধারিত হবে" এই হাদীসের ব্যাখ্যা কী?

জবাব: এটা সহীহ হাদীস। যদিও হাদীসটি সহীহাইনে বর্ণিত হয়নি। হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন, হাদীসটি চল্লিশজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন।

আরো বর্ণিত হয়েছে: “খিলাফতের দায়িত্ব **কুরাইশ** গোত্রের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে”। এই বিষয়টি মুআবিয়া থেকেও বর্ণিত হয়েছে। সহীহাইনে মুআবিয়া ও মুগীরাহ বিন শু‘বাহ এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ اثْنَانِ

“যতদিন পর্যন্ত **কুরাইশ** গোত্রের দুইজন ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই দায়িত্ব **কুরাইশ** গোত্রের অধীনেই থাকবে”। হাদীসটি সহীহ।

মুসলিমগণ প্রথম যুগে এই হাদীসগুলোর প্রতি আমল করতেন। সুতরাং তারা **কুরাইশ**ী ব্যতীত অন্য কাউকে নিজেদের আমীর বানাতেন না। এমনকি

এই মাসআলায় জমহূর বা সকল আলেমের ইজমা সাব্যস্ত আছে যে, খলীফা একমাত্র **কুরাইশ**ী ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না।

অবশিষ্ট থাকল এই বিষয়টি যে, যখন খিলাফতের দায়ভার কোনো কুরাইশী গোত্রের বহির্ভূত ব্যক্তি জোরপূর্বক দখল করে নিবে এবং তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন করণীয় বিধান কী?

তখন অনিষ্টতার পথ বন্ধ করার স্বার্থে ও ফিৎনা সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে উক্ত ক্ষমতাসীন ব্যক্তিকে মান্য করা ও তার প্রতি আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর মুসলিমগণ সর্বদা অথবা **কুরাইশ**ীদের মধ্য হতে আমীর নির্ধারণ করার যুগ পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যেই ছিল। যখন খিলাফত **কুরাইশ**ীদের মধ্য হতে উঠে গেল আর অন্য দখলদাররা ক্ষমতা দখল করল, তখন থেকে মুসলিমগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আর তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেল যেমনটি তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং আমি যেটা বলি সেটা হলো: মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও শাসকদের উপরে ওয়াজিব হলো একজন **কুরাইশ**ী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে তাকে নিজেদের নেতা বানিয়ে দেওয়া।

আর **কুরাইশ**ীদের মধ্যে অনেক ছালেহ ব্যক্তিও আছেন। অনেক **কুরাইশ**ী আছেন যারা মিসরে বসবাস করছেন। অনেকে হারাম অঞ্চলে বসবাস করছেন। আর ইয়েমেনের **কুরাইশ**ী লোকগণ ছালেহ, তারা কবরপূজারী নন। আমি এই যে কথাটি বললাম, এটা বাস্তবায়ন করা মুসলিম শাসকবর্গের উপরে ওয়াজিব; তারা নিজেরা নিজেদের জন্য কোনো একজন **কুরাইশ**ীকে শাসক নির্ধারণ করবে এবং প্রত্যেক নেতৃত্ববান ব্যক্তি নিজের ক্ষমতাকে তার নিকট সমর্পণ করে দিবে। যাতে করে তারা তাদের সকলের লক্ষ্যকে ঐক্যে পরিণত করতে পারে। এমনকি তারা যদি এটা করে, তাহলে তারা ইসলামের শত্রুদের সঙ্গেও মুখোমুখি হতে পারবে। কিন্তু যখনি মুসলিমগণ বিভক্ত হয়ে যাবে এবং একটি রাষ্ট্র থেকে দুইটি রাষ্ট্র জন্ম লাভ করবে, তখন ইসলামের শত্রুরা মুসলিমদেরকে মুসলিমদের দ্বারাই আঘাত করতে

থাকবে এবং এরই মাঝে নিজেদের স্বার্থ হাছিল করে নিবে। আর আমাদের জন্য তারা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও বন্দুক আমদানি করবে এবং আরো এই জাতীয় হাতিয়ার আমদানি করবে। আর এরই মাঝে তারা ফায়দা হাছিল করে নিবে।

প্রশ্ন ২৫: ঐ সকল শাসকদের জন্য দুআ করার বিধান কী, যারা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার শরীআতকে মিম্বারগুলোতে, গ্রন্থসমূহে, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনসমূহে বাস্তবায়ন করেন। আর যে সকল মুসলিম আলেম আল্লাহর শরীআত বাস্তবায়ন করেন না, তাদের কথা বাদ?

জবাব: জুম'আর খুত্ববাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপলক্ষে শাসকের কোনো কৃতকর্মের অথবা কোনো সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত করার অথবা আল্লাহর শরীআতকে প্রতিষ্ঠিত করার কারণে শাসকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাতে কোনো সমস্যা নেই। আর রসূল **সাল্লাল্লাহু** আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ، لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল না, সে মানুষেরও শুকরিয়া আদায় করল না"। আবূ দাউদ হাদীসটি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। সহীহ লি গাইরিহি: তিরমিযী হা/১৯৫৫।

তবে জুম'আর খুত্ববাতে ধারাবাহিকভাবে বলতে থাকলে এটা বিদআত বলে ধর্তব্য হবে। যেমনটি শাত্বিবী আল ই'তিছামে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল। আর তা ছাড়া এই বিষয়টি বারংবার ও বেশী পরিমাণে করা যাবে না, যাতে করে শাসক ধোঁকায় না পড়ে যায়।

প্রশ্ন ২৬: মুসলিমগণের একক ও একমাত্র খলীফার ব্যাপারে বর্ণিত এই হাদীসটি কি ঐ চরিত্রহীন ক্ষুদ্র দলের লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভব?

জবাব: মুসলিমগণের উপরে আবশ্যক হলো তাদের জন্য মাত্র একজন কুরাইশী শাসক থাকবে। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ اثْنَانِ

"যতদিন পর্যন্ত দুইজন কুরাইশী ব্যক্তি জীবিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই দায়িত্ব তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে"। আবার কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

لَا يَقُوْمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ

"তাদের উপরে যে কোনো ব্যক্তিই জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে থাকুক না কেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন"।

হাফেয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বলেছেন, হাদীসটি প্রায় চল্লিশজন **সাহাবী** থেকে বর্ণিত হয়েছে। জামি'উত তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছেঃ

الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ

"খিলাফতের দায়ভার কুরাইশীদের উপরেই ন্যস্ত থাকবে" ।

সুতরাং সকল মুসলিমের একজন একক কুরাইশী খলীফা লাগবে। এটাই হলো ওয়াজিব। আর বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হওয়ার পর থেকেই তারা একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে আছে। অন্যথায় তাদের জন্য প্রকৃত ওয়াজিব কর্তব্য হলো তাদের একজন নির্দিষ্ট কুরাইশী শাসক থাকতে হবে। যদি আজ তাদের একজন কুরাইশী শাসক থাকত, তাহলে আমেরিকা সহ অন্যান্য কাফের রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করা লাগত না। কারণ তাদের জীবন ব্যবস্থা ও প্রতারণাও ধর্মহীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কখনো কখনো তারা বলে তিন ইলাহ। আবার অন্যরা বলে, উপাস্য হলেন পিতা ও পুত্র। আবার কখনো কখনো তারা এমন এমন কথা বলে। সুতরাং তাদের জীবন ব্যবস্থা তীব্র পিপাসার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু যখন মুসলিমগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেল, আর প্রত্যেক শহরে একজন করে আমীরুল মুমিনীন এর আবির্ভাব হলো, তখন যা ঘটার তাই ঘটল।

অবশিষ্ট থাকল কোনো কুরাইশ গোত্র বহির্ভূত ব্যক্তির ক্ষমতার মসনদ দখল করে নেওয়ার বিষয়টি। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিকে মান্য করা ও তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে, যদি সে মুসলিম হয়ে থাকে। মুসলিমদের জীবন রক্ষার স্বার্থে এবং ফিৎনাসমূহ উৎপাটনের লক্ষ্যে তাকে মান্য করতে হবে এবং তার প্রতি আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

প্রশ্ন ২৭: মুসলিম শাসকবর্গকে লোকসম্মুখে উপদেশ দেওয়া যাবে নাকি উপদেশ গোপনে দিতে হবে?

জবাব: যদি তারা গোপনে প্রদানকৃত উপদেশ গ্রহণ করে, তাহলে তাই করা উচিত। আর যদি তারা গোপনে প্রদানকৃত উপদেশ না মানেন, তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই বাণী প্রযোজ্য হবে:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"তোমাদের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কোনো ঘৃণ্য কাজ সংঘটিত হতে দেখে, তাহলে সে যেনো নিজ হাত দ্বারা বাঁধা দেয়। যদি তা না পারে, তাহলে

যেনো স্বীয় জ্বিহবা দ্বারা বাঁধা দেয়। আর যদি তা না পারে, তাহলে যেনো সে নিজ অন্তরে বিষয়টিকে ঘৃণা করে। আর এটা হলো ঈমানের সর্বনিম্নস্তর"। সহীহ মুসলিম হা/৪৯।

আর গোপনে তোমার উপদেশ প্রদান করার হাদীসটি আমার মতে সহীহ নয়। তবে সে যদি তা মেনে নেয়, তাহলে তার বিষয়টিকে তুমি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করো। কিন্তু যখন তুমি সমাজে মানুষের সামনে এই বিষয়ে কথা বলবে, তখন তুমি তাদেরকে এই বার্তা দিচ্ছ যে, তুমি ফিৎনার আহবায়ক নও। তুমি মানুষকে বিদ্রোহের প্রতি উস্কে দিচ্ছ না। অসৎ কর্মকে দূরীভূত করতে হলে সেটার বর্ণনা অবশ্যই প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে। আর তুমি এও ঘোষণা করবে যে, তুমি ফিৎনার আহবায়ক নও। তুমি শাসকবর্গের বিপক্ষে জনমতকে উস্কে দিচ্ছ না। কারণ এটা শাসকবর্গের বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কে দেওয়ার সময় নয়। কিন্তু তুমি কথা বলবে এই হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"তোমাদের মধ্যে যেকোন ব্যক্তি যদি কোনো কোনো ঘৃণ্য কাজ সংঘটিত হতে দেখে, তাহলে সে যেনো নিজ হাত দ্বারা বাঁধা দেয়। যদি তা না পারে, তাহলে যেনো স্বীয় জিহবা দ্বারা বাঁধা দেয়। আর যদি তা না পারে, তাহলে যেনো সে নিজ অন্তরে বিষয়টিকে ঘৃণা করে। আর এটা হলো ঈমানের সর্বনিম্নস্তর"। সহীহ মুসলিম হা/৪৯।

আর যদি সত্য কথার বর্ণনা ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে উক্ত শাসকবর্গ কখন সত্যের পথে আসবে? আর আমার নিকট আশ্চর্যকর মনে হয় শায়েখ আদাম আল মিসরী – রহিমাহুল্লাহু তা'আলা – এর সম্পর্কিত বর্ণনাটি, যা একটি কৌতুক বা ঠাট্টা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে আমি আনোয়ার সাদাত এর কুফর এর ব্যাপারে তার সঙ্গে একমত কি-না সেই বিষয়টি এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। তার সম্পর্কিত বর্ণনাটি হলো তিনি মাসজিদে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান পাঠ করে কোনো কোনো সমালোচনা ও ত্রুটি উল্লেখ না করেই বলতেন, সাদাত কাফের। এরপরে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, যখনি কেউ শাসকদের ব্যাপারে কথা বলতে যায়, তখনি মানুষ পলায়ন করতে থাকে। কারণ যখন অনুসন্ধান শুরু হয়, তখন তাদের সকলকেই টার্গেট করা হয়। এরপরে তিনি মাইক্রোফোন দ্বারা রাস্তায় অবস্থানকারীদের সাথে সংযুক্ত হতেন এবং বলতেন, সাদাত কাফের। এই শায়েখ আদাম এর নিকট আসলে জেলখানার কক্ষ অধিক প্রিয় বা অধিক পছন্দনীয়। আর তার পার্শ্বদেশে জড়ানো চাদর কারাবাসের জন্য

প্রস্তুত হয়ে আছে। অর্থাৎ যখন তারা তাকে গ্রেফতার করবে, তখন তিনি এর কোনোই পরওয়া করবেন না। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

সুতরাং নসীহত তখনি গোপনে হবে, যখন এটা জানা যাবে যে, তারা নসীহত গ্রহণ করবে। অথবা এটা নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, মিম্বারের উপরে বসে নছীহতের বিষয়টি ফিৎনার জন্ম দেয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যায় কাজ এর দ্বারা বন্ধও হয়ে যায়। সমাজের একটি বিরাট অংশে সরকারের অনেক গুপ্তচর থাকে। যাদের নিকট সংবাদটি পৌঁছলে মানুষ এর সমালোচনা করবে এই ভয়ে কখনো কখনো তারা এমন অন্যায় কাজকে মিটিয়ে দেয়। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

প্রশ্ন ২৮: যখন আমরা আমাদের অঞ্চলগুলোতে কুফরের বিপক্ষে আমল না করে বসে থাকি, তখন কীভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে?

জবাব: আল্লাহর প্রশংসায় দাওয়াত নিশ্চয় অধিক উপকারী। আর আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়াটা তাদের বিপক্ষে কামান ও মেশিনগান নিয়ে বের হওয়ার চেয়ে অধিক উপকারী। আর আমি বিশ্বাস করি তারা এটাই পছন্দ করে যে, আমরা তাদের বিপক্ষে কামান আর মেশিনগান নিয়ে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ি। যাতে করে তারা মানুষের জন্য আল্লাহর পথে আহবান করার এই মহৎ কর্ম ও আল্লাহর পথে আহবানকারীদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

সুতরাং আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়াটা অধিক লাভজনক। আর আমি যুবকদেরকে নসীহত করছি যে, তারা যেনো গাম্ভীর্যের সাথে অগ্রসর হয় এবং ইসলামের জন্য কাজ করে। তারা যেনো আল্লাহর দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করে। কখনো কখনো প্রচণ্ড উদ্দীপনামূলক আবেগ ইসলামের গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়ে উঠে। আলহামদুলিল্লাহ আহলুস সুন্নাতের সদস্যগণ অবিরামভাবে দাওয়াত ও ভীতি প্রদর্শনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কার্যক্রমের সূচনাতে যুদ্ধে জড়াতেন না।

আমাদের উচিত আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীরাত অধ্যয়ন করা। যার ফলে যোগ্য মানুষ তৈরি হয়। আল্লাহ তা'আলা নাযিলকৃত এই আয়াতে বলেছেন,

"যাদের বিপক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা (যুদ্ধের) অনুমতি দিলেন এই কারণে যে, তাদের প্রতি জুলম করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম"।

সুতরাং শক্তি গঠনের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি তৈরি করা অত্যধিক জরুরী। যদি আল্লাহর পথের দাঈগণ দাওয়াতের কাজ কায়েম করেন, তাহলে কমিউনিস্ট, বাথ ও নুসায়রীয়্যা সম্প্রদায় তাদের দাওয়াতের সামনে গলে যাবে। কিন্তু আল্লাহর পথের দাঈগণ একে অপরের সাথে কাদা ছুড়াছুড়িতে ব্যস্ত হয়ে আছেন। প্রত্যেকেই মানুষকে নিজের দলে ধরে রাখার চেষ্টা করেন ।

প্রশ্ন ২৯: মুসলিম শাসকের জন্য দুআ করার বিধান কী?

জবাব: খুত্ববার মাঝে কখনো কখনো মুসলিম শাসকের হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য দুআ করা যায়। তবে তাদের স্থায়ীত্বের পক্ষে দুআ করাটা উচিত নয়। কারণ তারা আমেরিকার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। অবশ্য হেদায়াত ও সংশোধনের দুআ করাটা ভালো একটি বিষয়। কিন্তু এটা ধারাবাহিকভাবে করা যাবে না। কারণ, স্থায়ীরূপে এমন দুআ করা হলে সেটা বিদআতে রূপান্তরিত হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

"হে ঈমানদারগণ! যখন জুম'আর সালাতের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা দ্রুতগতিতে আল্লাহর যিকরের দিকে অগ্রসর হও"। সূরা জুমআ ৬২:৯।

আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল। এছাড়াও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে বিস্তর ফারাক রয়েছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো বিদ্রোহ আর আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে শুধুমাত্র এতটুকুই দিয়েছে যে, তারা তাদের অনুসারীদেরকে আর মানুষদেরকে এই ফতোয়া দেয় যে, "শাসকগণ কাফের"। আর আহলুস সুন্নাহ এর সদস্যগণ একমাত্র তাকেই কাফের বলে, যাকে আল্লাহ কাফের বলেছেন এবং যে কুফরকে অনিবার্যকারী কোনো কাজ করে। একমাত্র এমন ব্যক্তিদেরকেই তারা কাফের বলে সিদ্ধান্ত দেয় এবং এই ক্ষেত্রে তারা কারোর পরোয়া করে না। আর যার কুফরের ব্যাপারে দলীল পাওয়া যায় না এবং যে ইসলামের কোনো শিক্ষা আঁকড়ে ধরে রাখে, তার ব্যাপারে কুফরের সিদ্ধান্ত না দেওয়াই উত্তম।

এছাড়াও এটা শাসককে কাফের বলার মাসআলা, যা আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ক্ষতি সৃষ্টি করে। যার কারণে আমরা আমাদের সরকারের সাথে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ে যায়। আর এটাই ইসলামের শত্রুরা কামনা করে।

প্রশ্ন ৩০: জামাআতুত তাহরীরের বক্তব্য অনুসারে এই যুগে মুসলিমদের উপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব কর্ম হলো খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। এটা কি সঠিক নাকি তাওহীদ ও অন্যান্য ইলমের প্রতি গুরুত্বারোপ করার বিষয়টি সহীহ?

জবাব: এটা রাফেযী পন্থী শীআদের একটি ভ্রান্ত প্রবণতা। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ স্বীয় মূল্যবান গ্রন্থ মিনহাজুস সুন্নাতে এই মতকে খণ্ডন করেছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ এইভাবে এটাকে খণ্ডন করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যেই বিষয়টিকে ওয়াজিব করেছেন তা হলো তাওহীদ। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয বিন জাবালকে বলেছেন, তুমি অচিরেই আহলুল কিতাবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট গমন করবে। তাদের প্রতি যেনো তোমার প্রথম দাওয়াত হয়: "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো হক্ব ইলাহ নেই" এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা।

মহান রব স্বীয় পবিত্র কিতাবে বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.

"আমি জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য। আমি তাদের নিকট কোনো রিযক্ব কামনা করি না এবং তারা আমাকে আহার করাবে এটাও তাদের কাছে কামনা করি না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র রিযক্বদাতা মহাশক্তিধর চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী"। সূরা আয যারিআত ৫১:৫৬-৫৮।

সুতরাং প্রথম ওয়াজিব হলো তাওহীদ। আর ইসলামী খিলাফত কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে আমাদের মাঝে ধর্মনিরপেক্ষবাদী, বাথ মতবাদী, নুসায়রীয়, সুফী, শীআপন্থী, মডার্নিজম এবং অধিকাংশ দল এমন মূর্খ, যদি তাদেরকে নেশা সেবন করা থেকে বাঁধা দেওয়া হয় তাহলে তারা ইমামকে জবেহ করার চেষ্টা করবে। তারা বলবে, তুমি একজন কঠোর লোক। আমরা তোমার নেতৃত্বের কারণে মদ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

সুতরাং মুসলিমগণ এটার উপযুক্ত নন। মুসলিমদের উপরে ওয়াজিব হলো তাওহীদের মাধ্যমে কর্ম শুরু করা। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম অবস্থায় মানুষদেরকে বলতেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا

"হে লোকসকল! তোমরা বলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাহলে তোমরা সফল হয়ে যাবে"। আরো বলতেন,

مَنْ يُؤْوِينِي؟ مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي

"হে লোকসকল! তোমাদের মাঝে এমন কে আছে, যে আমাকে আশ্রয় দিতে পারবে? আমাকে সাহায্য করতে পারবে? যাতে করে আমি আমার রবের বার্তা পৌঁছে দিতে পারি"। আর যখন তুমি নবীগণের সীরাত পাঠ করবে, তখন দেখতে পাবে, তারা সর্বপ্রথম যে কর্ম দ্বারা তাদের কার্যক্রম শুরু করতেন, তা হলো তাওহীদের আহ্বান। যেটা সূরা আল আরাফে ও অন্যান্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে: তারা তাওহীদের পথে দাওয়াতের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম শুরু করতেন।

সুতরাং আমি বলি, এটা শীআদের রাফেযী সম্প্রদায়ের মতবাদ, যা পরিহার করা ওয়াজিব। আমি ভাইদেরকে এই নসীহত করছি যে, তারা যেনো আকীদার দাওয়াতের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এরপরে যখন মুসলিমদের সক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন তারা জিহাদ কায়েম করবে। খিলাফতের দাওয়াতের ক্ষেত্রে তারা জিহাদ ও খিলাফতের দাওয়াত কায়েম করতে পারবে না। হে মিসকীন! তুমি তো ব্রিটেন অথবা আমেরিকার সমর্থনে দাঁড়িয়ে আছ। যারা তোমাকে এক মুহূর্তেই গিলে ফেলতে পারে। আর তুমি কিনা নিজেকে নেতৃত্বের পথে আহবান করার দায়িত্বে নিয়োজিত করছ। তুমি আকীদার পথে আহবান করছ। আবার শিষ্টাচার ও ইসলামী নৈতিক বিষয়াদির দিকেও আহবান করছ।

আর যখন মানুষ বাতিলের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে এবং কমপক্ষে শতকরা পঞ্চাশ অথবা শতকরা চল্লিশজন এমন হবে, যারা সরল পথে প্রতিষ্ঠিত এবং শত্রুদের মুখোমুখি হতে সক্ষম এবং সাহাবীগণ যেসকল বিষয়ের উপরে ধৈর্যধারণে সক্ষম হয়েছেন, সেসকল বিষয়ে তারা ধৈর্যধারণে সক্ষম হবে, তখন আর কোনো বাঁধা থাকবে না। অন্যথায় স্বয়ং মহান রব আল্লাহ তা'আলা সাহাবীগণকে মক্কায় থাকাকালে জিহাদের অনুমতি দেননি। যুদ্ধের সক্ষমতা ও শক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

"যাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করা তাদেরকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হলো এই কারণে যে, তারা জুলমের শিকার হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম"। সূরা আল হাজ্জ ২২:৩৯।

এরপরে তারা নিজেদের আত্মরক্ষা এবং ইসলামের আত্মরক্ষায় সক্ষম হওয়ার পরে তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। অথচ ইতোপূর্বে তাদের কোনো কোনো সদস্যকে প্রহার করা হয়েছে। যেমন আবূ বকরকে প্রহার করা হয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রহার করা হয়েছে। আম্মার বিন ইয়াসিরকে প্রহার করা হয়েছে। সুমাইয়্যাকে হত্যা করা হয়েছে। আম্মারের পিতাকে হত্যা করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদকে হত্যা করা হয়েছে। বহু সংখ্যক সাহাবাকে প্রহার করা হয়েছে। তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে। এরপরেও তারা ধৈর্য্যধারণ করেছেন। এরপরে এক পর্যায়ে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জিহাদের অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

প্রশ্ন ৩১: কীভাবে মুসলিম উম্মাহ নিজেদের ইমামকে বাছাই করবে? বিষয়টি কি ইজতিহাদী নাকি কিতাব ও সুন্নাহ কর্তৃক বর্ণিত দলীল দ্বারা সাব্যস্ত?

জবাব: এই উম্মাহ নিজেদের ইমাম বাছাই করবে আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ বা রাষ্ট্রের যোগ্য ও অভিজ্ঞ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

"যখন তারা কোনো নিরাপত্তা অথবা ভয় সংক্রান্ত বিষয়ে পতিত হয়, তখন তারা সেটাকে প্রচার করে বেড়ায়। যদি তারা বিষয়টিকে আল্লাহর রসূল **সাল্লাল্লাহু** আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট সমর্পণ করত, তাহলে বিষয়টির বাস্তবতা তাদের গবেষকগণ অনুধাবন করতে পারত"। সূরা আন নিসা ৪:৮৩।

শাওকানী ফাতহুল ক্বাদীর গ্রন্থে বলেছেন, "তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আলেম ও আমীরগণ।

সুতরাং নেতৃস্থানীয় যোগ্য ও অভিজ্ঞ গবেষক দল একমত হয়ে মুসলিমদের জন্য একজন কুরাইশী ইমাম নির্ধারণ করবেন। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ। "শাসকগণ কুরাইশ বংশ থেকে নির্ধারিত হবে"। মুসনাদে আহমাদ।

الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ

“খিলাফতের দায়িত্ব কুরাইশ বংশের মধ্যে থাকবে”। সহীহ আল জামে হা/৩৩৪২।

لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِيْ قُرَيْشٍ مَا أَقَامُوْا الدِّيْنَ

“যতক্ষণ পর্যন্ত তারা দীন কায়েম রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই দায়ভার কুরাইশ বংশের নিকট থাকবে”।

আর যদি এই দায়িত্ব কুরাইশী নয় এমন কোনো ব্যক্তি জোরপূর্বক দখল করে নেয় আর তার ক্ষমতা দৃঢ় হয়ে যায়, তাহলে সে মুসলিম হলে তাকে মান্য করা ও তার আনুগত্য করা ওয়াজিব:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আনুগত্য করো”। (আন নিসা ৪:৫৯) ।

এমনিভাবে যখন কুরাইশী নয় এমন কোনো ব্যক্তি এই দায়িত্ব জোরপূর্বক দখল করে নেয়, তখন ফিৎনার উৎপাটন ও মুসলিমদের জীবন রক্ষার স্বার্থে তাকে মান্য করা ও তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। **আর মুসলিমদের উপরে ওয়াজিব হলো তাদের একজন ইমাম থাকতে হবে।** যদি তারা একাধিক ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়, তাহলে ইসলামের শত্রুরা তাদের উপরে চেপে বসবে।

আমরা বলেছি, **তাদের জন্য একজন ইমাম থাকা আবশ্যক।** এর দলীল হলো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ

“তোমাদের নেতৃত্ব ও শাসন ঐক্যমত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় যদি তোমাদের মাঝে কেউ বিছিন্নতা সৃষ্টি করতে আসে, তাহলে তাকে মেরে ফেলো”। সহীহ মুসলিম হা/১৮৫২।

এটাই হলো খিলাফতের প্রকৃত শান, যা মুসলিমদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা ও বাস্তবায়ন করতে সাধ্য মত চেষ্টা করা ওয়াজিব।

আমরা রাফেযীদের ন্যায় এই কথা বলি না: খিলাফতই হলো প্রথম এমন বিষয়, যার গুরুত্ব দেওয়া ওয়াজিব। বরং “লা ইলাহা ইল্লাল্লহ ও মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ” এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রথম ওয়াজিব। যেমন সহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে: নাবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মু‘আয বিন জাবালকে ইয়েমেনে পাঠালেন, তখন বললেন,

إِنَّكَ سَتَأْتِيْ قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهَ

“তুমি অচিরেই এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছবে, যারা আহলুল কিতাব। সুতরাং তাদের প্রতি যেনো তোমার প্রথম দাওয়াত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই এই মর্মে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতি। সহীহ বুখারী হা/৪৩৪৭।

আর কাফেরের কোনো ক্ষমতা মুসলিমদের বিপক্ষে কার্যকর হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

“স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীমকে তার রব কতিপয় বিষয়ে পরীক্ষা করলেন। অতঃপর তিনি সেগুলোকে পূর্ণ করলেন। তার রব বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির ইমাম (নেতা) নির্ধারণ করছি। তখন তিনি বললেন, আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও করে দিন। তখন তিনি বললেন, জালিমরা আমার অঙ্গীকারের মাঝে শামিল হবে না”। (আল বাক্বারাহ ২:১২৪)। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

“তোমরা ঐ সকল সীমালঙ্ঘনকারীর আনুগত্য করো না, যারা যমীনে বিবাদ সৃষ্টি করে এবং সংশোধনের কাজ করে না”। (আশ শু‘আরা ২৬:১৫১-১৫২)।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তোমাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আনুগত্য করো”। (আন নিসা ৪:৫৯)।

প্রশ্ন ৩২: ইসলামী শরীআত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র অধিক নিকটবর্তী?

জবাব: সকল রাষ্ট্রই আসলে আমেরিকার এজেন্ট। কোনো রাষ্ট্রই এর বাইরে নয়। কিন্তু ইসলামী শরীআতের অধিকতম নিকটবর্তী হলো হারামাইন আর নাজদ এর শাসনব্যবস্থা। আর ইয়েমেনের শাসনে এখনো অনেক মহত্ব বিদ্যমান। তবে ইয়েমেনের এই মহৎ শাসনব্যবস্থার পেছনে মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার করুণার ফলেই সংগঠিত হয়েছে। আর এরপরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অবদান রয়েছে। আর হারামাইন শরীফাইনের শাসনব্যবস্থার পেছনে প্রথমত মহান আল্লাহর দয়া এবং এরপরে তাওহীদবাদী মহান আলেমদের অবদান রয়েছে। যেমন শায়েখ বিন বায – আল্লাহ তাকে রহম করুন এবং ক্ষমা করে দিন। এমনি আরো অনেক মহান শায়েখদের অবদান এতে রয়েছে। আসল কথা হলো এই দুইটি শাসনব্যস্থা ইসলামী শরীআতের অত্যধিক নিকটবর্তী শাসনব্যস্থা।

প্রশ্ন ৩৩: যদি কোনো রাষ্ট্র এমন হয়, যেই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ জনসংখ্যা মুসলিম হবে আর রাষ্ট্র প্রধান এবং অন্যান্য আমলাগণও মুসলিম হবে। অপরদিকে উক্ত রাষ্ট্রটি অল্প কিছু ক্ষেত্র যেমন বিবাহ, মীরাছ ইত্যাদি ছাড়া অন্যকোনো ক্ষেত্রে ইসলামী শরীআহ বাস্তবায়ন করে না। তাহলে উক্ত রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যেতে পারে কি?

জবাব: রাষ্ট্রের মাসআলার ক্ষেত্রে আহলুল হাল্লি ওয়াল আদল (বুদ্ধিজীবীগণ) এর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে। তাদের কি জ্ঞান আছে না-কি তারা মূর্খ? তারা কি মনে করে যে, মানবরচিত আইন আল্লাহর আইনের ন্যায় বা তার চেয়েও অধিক উত্তম? তারা কি রাষ্ট্রীয় আইন মানতে বাধ্য নাকি বাধ্য নয়? তাদেরকে রাষ্ট্রীয় আইন মানতে বাধ্য করা হয়নি এটা জানা বিষয়। এখন অবশিষ্ট থাকল এই দুইটি বিষয় যে, তারা মূর্খ কি-না? কারণ, যদি তারা মূর্খ হয়ে থাকে, তবে তারা অপারগ বলে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় বিষয় হলো – আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দান করুন – তারা কি মানবরচিত আইনকে আল্লাহর আইনের সমান মনে করে? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধান বাস্তবায়নের পন্থা খুঁজছে। বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য অন্য কারোর আইন আল্লাহর আইনের চেয়ে অধিক উত্তম হতে পারে না" । (আল মায়িদাহ ৫:৫০) ।

যদি তারা উভয় আইনকেই সমান বা মানব রচিত আইনকে অধিক উত্তম মনে করে, তবে এটাও কুফর বলে বিবেচিত হবে। যদি প্রথম শর্ত অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বুদ্ধিজীবীগণ বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্ন ৩৪: একাধিক রাষ্ট্র ও একাধিক স্বাধীন শাসক থাকার বিধান কী?

জবাবঃ এই বিষয়ে আলেমদের মতানৈক্য রয়েছে। তবে সহীহ মত হলোঃ **মুসলিমদের মাত্র একজন** কুরাইশী **ইমাম বা শাসক থাকবেন।** যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

"শাসক নির্ধারিত হবে কুরাইশ বংশ থেকে" । তিনি আরো বলেছেন,

الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ

"খিলাফতের দায়ভার কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে"। আর হাফেয ফাতহুল বারীতে বলেছেন, এই হাদীসটি প্রায় চল্লিশজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি আরো বলেছেন,

لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ

"নেতৃত্বের এই দায়িত্ব কুরাইশদের মাঝেই থাকবে, যতদিন পর্যন্ত তাদের দুইজন ব্যক্তিও অবশিষ্ট থাকবে"। সহীহ বুখারী হা/৩৫০১। আরো বলেছেন,

لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِيْ قُرَيْشٍ فَمَنْ خَذَلَهُمْ أَكَبَّهُ اللهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ

"এই দায়িত্ব চিরদিন কুরাইশদের মাঝেই থাকবে। যদি কেউ দায়িত্বশীল কুরাইশীকে অপদস্থ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে নাকের উপরে অধঃমুখী করে (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করবেন"।

সুতরাং তাদের উপর ওয়াজিব হলো তাদের সকলের জন্য একজন ইমাম নির্ধারণ করতে হবে।

সুতরাং এখন একমাত্র আল্লাহর নিকট মুসলিমদের সকল অভিযোগ। মুসলিম শাসকদেরকে বাদ দাও, তাদের প্রতি কোনো বিশ্বাস রাখা যায় না। তারা আমেরিকার বলয়ের অধীনে চলে। তারা কোনো কর্ম বাস্তবায়ন আমেরিকার অনুমতি ছাড়া করতে পারে না। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে বলেছি এই আয়াতের দৃষ্টিতেঃ

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"এমনিভাবে আমরা কিছু জালেম ব্যক্তিকে কিছু জালেম ব্যক্তিদের শাসক বানিয়ে দেয় তাদেরই কৃতকর্মের কারণে"। সূরা আল আনআম ৬:১২৯।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকটে তাওবা করা।

প্রশ্ন ৩৫: মুসলিম উম্মাহর জন্য তাদের শাসক বাছাই করার বিষয়টি কি তাওক্বীফী না-কি যেকোনো বৈধ পন্থায় — যদিও সেটা কাফেরদের দর্শন থেকেই গ্রহণ করা হয় — শাসক বাছাই করা যাবে?

জবাব: নেতৃত্ব বা শাসনক্ষমতার দায়িত্বশীল নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদের নেতৃবৃন্দকে একত্রে আলোচনার মাধ্যমে একজন নেককার ব্যক্তিকে শাসক হিসেবে বাছাই করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

"আর যখন তাদের কাছে নিরাপত্তা বা ভয় সংক্রান্ত কোনো সমস্যা আবির্ভূত হয়, তখন তারা যদি উক্ত সমস্যাটি সমাধান নির্ণয়ে রসূলের শরণাপন্ন হতো, তাহলে তাদের গবেষকগণ উক্ত সমস্যার সমাধান উদঘাটন করতে পারত"। (আন নিসা ৪:৮৩)।

আর যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি শাসনক্ষমতা দখল করে নেয়, তাহলে তাকে মান্য করা ও তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

তবে আমরা বর্তমানে নির্বাচন, ভোট গ্রহণ, বিক্ষোভ মিছিল এবং অনর্থক কথার মাধ্যমে যেভাবে শাসক নির্ণয় করি, তা ইসলামে সাব্যস্ত হয়নি। বরং এই পদ্ধতি ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে এসেছে। আর ভোট প্রদান তাগূতী পদ্ধতি হওয়ার বিষয়ে আমরা একাধিক রেকর্ডে আলোচনা করেছি। এমনিভাবে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন পদ্ধতিটিও তাগূতী পদ্ধতি হওয়ার পক্ষে আমরা একাধিক রেকর্ডে আলোচনা করেছি। আর গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ এই বিষয়েও আমরা একাধিক রেকর্ডে আলোচনা করেছি।

সুতরাং মূল মাসআলা হলো: মুসলিমগণ ইসলামের শত্রুদের অন্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছে। আর তারা তাদের অনুসারীদেরকে ভোট প্রদান ও নির্বাচনের পোশাক

দিয়ে আবৃত করে দিয়েছে। অন্যথায় এই জাতীয় ভোট প্রদান আর নির্বাচন পদ্ধতি তারা যতটুকু পরিমাণ ধার্য করে দিয়েছে, তার চেয়ে বেশী বাস্তবায়িত হয় না।

যেমন তারা এই সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় যে, অমুক ব্যক্তি রাষ্ট্র প্রধান হবে। আর অমুক ব্যক্তি মন্ত্রী বা পার্লামেন্ট মেম্বার হবে ইত্যাদি। যেমন একদা কোনো একজন আব্বাসী খলীফা খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সময় জ্যোতিষীরা একত্রিত হয়ে বলল, আমরা অচিরেই বুঝতে পারব যে, এই ব্যক্তি কতদিন পর্যন্ত শাসনক্ষমতায় টিকে থাকবে। তখন তাদের মধ্যে একজন কৌতুককারী বলল, তুর্কিরা যতদিন চায়, ততদিন সে ক্ষমতায় টিকে থাকবে। আর সে পরবর্তীতে তুর্কিদের সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্তই টিকে ছিল।

প্রশ্ন ৩৬: জরুরী পরিস্থিতিতে মামলা মকদ্দমার ক্ষেত্রে আমেরিকান আদালতসমূহের কাছে শরণাপন্ন হওয়ার বিধান কী?

জবাব: যদি তোমরা অন্যকোনোভাবে তাদের সহযোগিতা ব্যতীত তোমাদের খনিজ সম্পদ উৎপাদন করতে না পার, তাহলে তাদের নিকট শরণাপন্ন হওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি তোমরা তোমাদের মধ্যকার মামলা মকদ্দমা সুরাহা করার লক্ষ্যে আলেমদের নিকট শরণাপন্ন হওয়াকে পছন্দ না করে তাদের নিকট শরণাপন্ন হতে চাও, তাহলে এটা কুফর বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى
ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ ۖ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا

"আপনি কি তাদের কথা চিন্তা করে দেখেছেন, যারা আপনার উপরে নাযিলকৃত এবং আপনার পূর্বে নাযিলকৃত অহীর উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী বলে দাবি করে। আর তাগূতের নিকট শরণাপন্ন হয় তাদের মামলার সুরাহা করার লক্ষ্যে। অথচ তাদেরকে তাগূতকে অস্বীকার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিতে চায়। সূরা আন নিসা ৪:৬০।

يريدون – শব্দটি মামলা উপস্থাপনের বিষয়টির সাথে নিয়্যাতের সম্পর্ক থাকার দলীল। তুমি তোমার অধিকার আইনের সাহায্য ব্যতীত অন্য কোনোভাবে আদায় করতে পারছ না একমাত্র এমন পরিস্থিতিতেই তোমার জন্য এই পথ অবলম্বন করা বৈধ হবে। আর যদি বিষয়টি এমন হয় যে, তুমি আইনের আশ্রয় নেওয়াকে পছন্দ

করছ কিন্তু আলেমদের নিকট শরণাপন্ন হওয়াকে পছন্দ করছ না, তাহলে এইক্ষেত্রে তোমার দ্বারা কুফর সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"তারা কি জাহিলিয়াতের বিধান তালাশ করছে। বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে আর কার বিধান উত্তম হতে পারে"। সূরা আল মায়িদা ৫:৫০।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمٗا

"আপনার রবের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে নিয়ে আপনার দেওয়া সিদ্ধান্তে তারা মানসিকভাবে কোনো কষ্ট পাবে না এবং নির্দ্বিধায় আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিবে"। সূরা আন নিসা ৪:৬৫।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٖ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا

"যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তখন কোনো মুমিন নর-নারীর জন্য তাদের সমস্যার সমাধানের অন্য কোনো উপায় অবলম্বনের অধিকার থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে স্পষ্টরূপে পথভ্রষ্ট হলো"। সূরা আল আহযাব ৩৩:৩৬।

এটাই হলো একমাত্র জবাব: যখন তুমি তোমার খনিজ সম্পদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে অন্য কোনো উপায় না পাবে, তখন তাদের নিকট শরণাপন্ন হওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি তুমি শরীআত সম্পর্কে অবগত হয়েও কারো জবরদস্তি ব্যতীতই তাদের বিধানকে শরীআতের বিধানের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান কর, তাহলে এটা কুফর বলে বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন ৩৭: আমাদের জন্য খারেজীদের হাত থেকে রক্ষার জন্য কি সরকারের নিকট সাহায্য চাওয়া জায়েয হবে?

জবাবঃ যদি সরকার সীমা অতিক্রম না করে, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি সরকার সীমা অতিক্রম করে, তাহলে তোমরা ধৈর্যধারণ করো। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে আর তাদের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ না করেন। আর যদি সরকার হত্যার উপযুক্ত নয় এমন ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং কয়েদী হওয়ার উপযুক্ত নয় এমন ব্যক্তিকে কয়েদী বানিয়ে সীমা অতিক্রম করে এবং এভাবে কিতাব ও সুন্নাহ এর সীমা মানে না, তাহলে আমার উপদেশ হলো তোমরা এমনক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা নিবে না।

হ্যাঁ, যদি সরকার কিতাব ও সুন্নাহ এর সীমা অতিক্রম না করে, বরং শাসন যদি শুধুমাত্র এই আয়াতকে লক্ষ্য করে প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে এমন সরকারের নিকট সাহায্য চাওয়াতে সমস্যা নেই। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মধ্যে যেনো এমন একটি দল থাকে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করে। তারাই হলো প্রকৃত সফল মানুষ"। সূরা আলে ইমরান ৩:১০৪।

প্রশ্ন ৩৮: শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কি বৈধ?

জবাবঃ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এটা এমন একটি বিপদ, যেই বিপদে মুসলিমগণ প্রাচীনকাল থেকেই ভুগে আসছেন। তবে আল্লাহর শুকরিয়া আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে করেন না। কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ

"তোমাদের নেতৃত্ব কোনো একজন ব্যক্তির হাতে থাকা অবস্থায় যদি কেউ এসে তোমাদের শক্তি নস্যাৎ করতে চায় অথবা তোমাদের ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, তাহলে তাকে হত্যা করো"। সহীহ মুসলিম হা/১৮৫২।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا

"যদি দুইজন খলীফার বায়আত নেওয়া হয়, তাহলে শেষের জনের গর্দান ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও"। সহীহ মুসলিম হা/১৮৫৩।

আর উবাদাহ বিন সামিত রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ»، قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»

"আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহবানে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করলাম। তখন তিনি আমাদেরকে এই বিষয়গুলোতে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, সুখে-দুঃখে, স্বচ্ছলতা-দারিদ্রাবস্থায় তাঁকে মান্য করা ও আনুগত্য করতে হবে। তাঁকে সর্বাবস্থায় আমাদের স্বার্থের উপরে প্রাধান্য দিতে হবে। আর আমরা ক্ষমতাসীন শাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়াব না। তবে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কোনো সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সাব্যস্ত প্রকাশ্য কোনো কুফর যদি তোমরা দেখতে পাও, তাহলে সেটা ভিন্ন বিষয়"। সহীহ মুসলিম হা/১৭০৯।

সুতরাং শাসকের বিরোধিতা করা একটি ফিৎনা বলে বিবেচিত হবে। যার কারণে মুসলিমদের মাঝে খুনাখুনি শুরু হয়ে যায় এবং মুসলিমরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি যদি শাসক কাফেরও হয়, তথাপি মুসলিমদের নিকট তাকে প্রতিহত করার মত শক্তি থাকা জরূরী। যাতে করে মুসলিমদের জীবন নষ্ট না হয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আল্লাহ স্বয়ং তার উপরে ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাকে অভিশাপ করেছেন এবং তার জন্য ভয়ানক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন"। সূরা আন নিসা ৪:৯৩।

সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত প্রাচীনকাল থেকেই মুসলিম শাসকের বিরোধিতা করাকে বৈধ মনে করেন না। আর এই যুগে কাফের শাসকের বিরোধিতা করার জন্য কয়েকটি শর্ত বিদ্যমান থাকা অত্যাবশ্যক। যদি সে এই বিষয়ে অজ্ঞ থাকে, তবে অবশ্যই তাকে এটা জেনে নিতে হবে। আর এই অযাচিত

বিষয়টি যেন আরো ভয়াবহ পরিণতি ডেকে না আনে এবং মুসলিমদের রক্ত যেন না ঝরে।

প্রশ্ন ৩৯: কিছু ইসলামী রাষ্ট্রে মদপান ও পতিতাবৃত্তির জন্য নির্ধারিত স্থান থাকে। অথচ শাসকগণ এমন অন্যায় কর্মের পরিবর্তনের পক্ষে কোনো পদক্ষেপ নেন না। এই অবস্থায় তারা যতক্ষণ পর্যন্ত এই অন্যায় কর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরোধিতা করার পক্ষে এই বিষয়টি কি দলীল হিসেবে যথেষ্ট হবে?

জবাব: তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিষয়ে সঠিক মাসআলা হলো যতক্ষণ তারা মুসলিম থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

“তবে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কোনো সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সাব্যস্ত প্রকাশ্য কোনো কুফর যদি তোমরা দেখতে পাও, তাহলে সেটা ভিন্ন বিষয়”। সহীহ মুসলিম হা/১৭০৯।

আর “তুমি কোনো বিদ্রোহের উস্কানি দিচ্ছ না এবং বিপ্লবের ডাক দিচ্ছ না” মর্মে মুসলিমদের ঘোষণা দেওয়ার পাশাপাশি কোনো শরী‘আ বিরোধী কর্মের প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। তুমি শুধুমাত্র এই অনৈতিক কর্মের আইন পরিবর্তনের আহবান করছ। তুমি শাসকদের বিদ্রোহ করার পরিবর্তে ঐ সকল দুরাচারী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছো, যারা সমাজকে বিনষ্ট করেছে। এটাই হলো ওয়াজিব দায়িত্ব। যখন মুসলিমরা মদপানকারীদেরকে দেখতে পাবে এবং তারা নিশ্চিত যে, সরকার এই ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের ধার ধারে না এবং তারা ফিৎনা থেকে নিরাপদে থাকবে আর এই অনৈতিক কর্মের প্রতিবাদের চাইতেও অধিক ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনার বিষয়েও নিরাপদ থাকবে, তখন এমন গর্হিত বিষয়ের মূলোৎপাট করাতে কোনো সমস্যা নেই। এমনিভাবে যখন তারা কোনো ব্যভিচারি নারী অথবা পুরুষকে দেখতে পাবে তখনও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। অথবা যখন তারা অনিষ্ট সাধনের জন্য নির্মিত কোনো ঘর দেখতে পাবে, তখনও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। আর পূর্ণ মর্যাদা হলো প্রতিষ্ঠিত রাখার মাঝে।

আর তাদের ব্যাপারে কুৎসা রটনা করার উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষকে তাদের (শাসকবৃন্দ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উস্কানি দেওয়া, তাহলে এটা বৈধ নয়। আর যদি উদ্দেশ্য হয় সংশ্লিষ্ট গর্হিত কাজের কর্মীদের বিরুদ্ধে মানুষকে উৎসাহিত করে তোলা, তাহলে এটা ভালো কাজ হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

“বনী ইসরাইলের কাফেররা দাউদ ও ঈসা (আলাইহিমাস সালাম) এর মুখে অভিশপ্ত হয়েছে। যার কারণ হলো তাদের নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘন। তারা তাদের মাঝে ঘটে যাওয়া অপরাধগুলোর ব্যাপারে একে অপরকে নিষেধ করত না। তাদের এই আচরণ কতইনা নিকৃষ্ট”। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোনো অপরাধ (সংঘটিত) হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা বাধা দেয়। যদি এটা করার সামর্থ তার না থাকে, তাহলে সে যেন নিজের যবান দ্বারা বাধা দেয়। আর যদি এটা করার সামর্থ তার না থাকে, তাহলে সে যেন নিজ অন্তর দ্বারা এই অপরাধের ঘৃণা করে। আর এটা হলো ঈমানের সর্বনিম্নস্তর”। সহীহ মুসলিম হা/৪৯।

আফসোস, আফসোস, ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি, যারা অন্যায়ের বিপক্ষে প্রতিবাদকারীদেরকে বলে, তুমি এমন কাজ করে সরকারের বিপক্ষে মানুষকে উস্কে দিচ্ছ। অথবা তুমি খারিজী। তোমরা মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করো না। নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়ো না। যে ব্যক্তি মানুষকে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের দিকে আহবান করে, সে মূলত ফিৎনার দিকে আহবানকারী। তবে যে ব্যক্তি মানুষকে (অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য) আহবান করে এবং অপরাধের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়, সে এমন নয়। এরপরে যদি অন্যায়কারী অন্যায় থেকে বিরত না হয়, তখন সে নিজের সঙ্গে অন্যায়কারীকে প্রহার করতে পারে এমন তিনজন অথবা চারজনের একটি দল নিয়ে উক্ত অন্যায় রুখে দেয়, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। যদি এই সংঘটিত এই অন্যায়ের প্রতিবাদ পরিণতিতে এর চাইতেও জঘন্য অন্যায়ের পথ খুলে না দেয়। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

প্রশ্ন ৪০: শাসনব্যবস্থার বিপক্ষে আন্দোলন করে তা মূলোৎপাটন করার পরে আমরা যদি মানুষকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বিষয়গুলোর ব্যাপারে অবগত করি যেমনটি কোনো কোনো ভাই বলে থাকেন। এই বিষয়ে আপনাদের মতামত কী?

জবাব: বর্তমান সময়ের আন্দোলনগুলো সমাজ সংস্কারের কারণ হতে পারে না। বরং এগুলো মুসলিমদের জন্য ফিৎনা ও দুর্বলতার কারণ।

প্রশ্ন ৪১: যে ব্যক্তি শাসকদেরকে আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়ছালা করল না, তারা কাফের" (সূরা আল মায়িদা ৫:৪৪) দ্বারা কাফের বলবে তার প্রত্যুত্তরে আপনি কী বলবেন?

জবাবঃ শাসকদের মাসআলা এমন একটি মাসআলা, যেই মাসআলার আঁচল অনেক দীর্ঘ, আর অর্জন অনেক অল্প। এই বিষয়ে তাদের মতানৈক্য আছে। বিধায় আমরা ঢালাওভাবে সকলকে কাফের বলতে পারব না। হ্যাঁ, যদি কেউ সুন্নাহ নিয়ে ঠাট্টা করে বা অস্বীকার করে অথবা বলে হাজারে আসওয়াদ চুমু খাওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ বানোয়াট। অথবা বলে আমরা কিতাব ও সুন্নাহ অনুসারে আমল করাকে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাগত জানাই, যতক্ষণ উভয়টি তাদের সংগঠনের মৌলিক নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হবে। তাহলেই সে ব্যক্তি কাফের বলে বিবেচিত হবে।

আর আমি প্রিয় ভাইদেরকে নসীহত করছি, আল্লাহর জন্য নসীহত করছি, তারা যেনো এই জাতীয় কর্মে যোগ না দেয় এবং শাসকদের সাথে সংঘর্ষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যেন তারা ইসলামের জন্য কাজ করে। আর তারা যত বেশী শাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়াবে এবং তাদের চলাচলকে বিঘ্নিত করবে, আমেরিকার চক্ষু ততই শীতল হবে। বিশেষত যখন আল্লাহর পথের দাঈগণ এবং সমাজ সংস্কারকগণ শাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়াবে, তখন তারা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

আমি প্রিয় ভাইদেরকে নসীহত করছি, তারা যেন নিজেদেরকে এমন কর্মে জড়িত না করে। যার অপরাধের তীব্রতা তাকে কুফর পর্যন্ত নিয়ে গেছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে যেন তারা কোনো বাতিল বিষয়ে বিতর্ক না করে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহাগ্রন্থে বলেছেন,

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ

"যারা নিজেদের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করে, তাদের সঙ্গে আপনি কোনো বিতর্ক করবেন না"। সূরা আন নিসা ৪:১০৭।

আর যে ইসলামের আঁচল আঁকড়ে ধরেও ইসলামের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে যেন কাফের বলার দুঃসাহসিকতা তারা না করে। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

প্রশ্ন ৪২: তাদের থেকে একমাত্র প্রকাশ্য কুফর সংঘটিত না হওয়া ব্যতীত আমরা তাদের সঙ্গে কোনো বিরোধিতা করব না মর্মে বর্ণিত উবাদাহ বিন সামিত এর হাদীসে বিদ্যমান শাসকগণ বলে কি আমাদের যুগের শাসকগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে?

জবাবঃ সহীহাইনে উবাদাহ বিন সামিত থেকে যেই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, সেখানে তিনি বলেছেন,

دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ. فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا. وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ. قَالَ :إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا.

"আমারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহবানে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করলাম। তখন তিনি আমাদেরকে এই বিষয়গুলোতে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, সুখে-দুঃখে, স্বচ্ছলতা-দারিদ্রাবস্থায় তাঁকে মান্য করতে হবে ও আনুগত্য করতে হবে। তাঁকে সর্বাবস্থায় আমাদের স্বার্থের উপরে প্রাধান্য দিতে হবে। আর আমরা ক্ষমতাসীন শাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়াব না। তবে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কোনো সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সাব্যস্ত প্রকাশ্য কোনো কুফর যদি তোমরা দেখতে পাও, তাহলে সেটা ভিন্ন বিষয়"। সহীহ মুসলিম হা/১৭০৯।

বর্তমান যুগের শাসকগণ প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের শাসক হওয়ার উপযুক্ত নয়। কারণ, তারা আসলে ইসলামের শত্রুদের এজেন্ট হিসেবে বিবেচিত। বিধায় তারা যোগ্য শাসক নয়। কিন্তু বিধান হলো যখন শাসনক্ষমতা কোনো শাসক জোরপুর্বক দখল করে নেয়, আর সামান্য ইসলামও যদি তার মাঝে বিদ্যমান থাকে, তবে মুসলিমদের জীবন রক্ষার স্বার্থে এবং ফিৎনা উৎপাটনের লক্ষ্যে তাকে মান্য করা ও আনুগত্য করা জরূরী।

এরপরে মহান আল্লাহ তা'আলাকে ডাকতে হবে। আর সমাজকে শাসকদের ব্যাপারে অবহিত করা হবে তারা এটার যোগ্য নয়। শাসকদের কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে যখন মানুষ জানতে পারবে, তখন তারা শাসকদের পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তৃপ্তি পাবে না।

আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ গ্রন্থে হাফেয ইবনু কাছীরের এই বর্ণনাটি আমাকে অভিভুত করে: একদা বাল্যকালে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একজন গল্পকার এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় — যখন তার সাথে তার পিতা উপস্থিত ছিলেন — বলল, যদি আমার ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করতাম। হাজ্জাজের পিতা ছিলেন একজন নেককার ব্যক্তি। তিনি বললেন, বৎস! আমি তো দেখছি, তুমি এক হতভাগা ছাড়া কিছুই না। মানুষকে উপদেশ দানকারী একজন ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি এমন কথা বলছ যে, আমার ক্ষমতা থাকলে আমি তাকে হত্যা করে দিতাম। তখন সে বলল, সে মানুষের নিকট আবূ বকর ও উমার এর

জীবনচরিত সম্পর্কে আলোচনা করছে। যখন মানুষ তাদের জীবনচরিত সম্পর্কে জানতে পারবে, তখন তারা আমীরুল মুমিনীনকে অপছন্দ করতে শুরু করবে। আমার এটা মনে নেই যে, সে কি (আমীরুল মুমিনীন) সুলায়মান এর কথা বলছিল নাকি আব্দুল মালিকের কথা বলছিল। বাস্তব হলো সে আব্দুল মালিকের কথাই বলছিল।

সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যখন আমরা মানুষকে দীন, কিতাব ও সুন্নাহ এর শিক্ষা দিব, আর ইসলামের শত্রুরা এবং শাসকরা এটা ভালো করেই বুঝে যে, মানুষ যখন আল্লাহর দীন গভীরভাবে বুঝতে পারবে, তখন তাদের স্বার্থ হাছিল হবে না। অন্যথায় গাদ্দাফী কেন আল্লাহর পথের দাঈগণকে জেলখানায় নিক্ষেপ করত? আর ছাদ্দাম কেনইবা শস্যক্ষেত্র আর মানুষদেরকে ধ্বংস করত। আবার আল্লাহর পথের দাঈদেরকে ও মুসলিমদেরকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করত।

ইরান ও ইরাকের মাঝে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে জনৈক ইরাকী এসেছিলেন। তিনি বললেন, কোনো মুসলিম যুবকের জন্য ফজরের সালাতে মাসজিদে যাওয়াকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর মাসজিদে গমনকারী এই যুবককে পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখা হয়। সিরিয়া ও অন্যান্য দেশেও একই অবস্থা। তারা মনে করে যে, মানুষ যদি আল্লাহর দীনের জ্ঞান অর্জন করে, তাহলে তারা শাসকদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসতে বাধ্য করবে অথবা তাদেরকে অপসারণ করবে। অন্যথায় নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহরর জন্য জর্ডানের ভূমি সঙ্কুচিত হয়ে যায় কেন? কারণ তারা জ্ঞানকে ভয় পায় এবং দীনকে ভয় পায়।

সুতরাং ইসলামের শত্রুরা ইলমের মর্যাদা বুঝে, দীনের মর্যাদা বুঝে। আর এই কারণেই যখন তারা কোনো শহরে প্রবেশ করে, তখন উক্ত শহরের লাইব্রেরীগুলো পুড়িয়ে ফেলে এবং আলেমদের হত্যা করতে শুরু করে। কারণ তারা সমাজের উপরে আলেমদের প্রভাব সম্পর্কে ভালো করেই জানে। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

প্রশ্ন ৪৩: প্রকাশ্য কুফরীর সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে কি শাসকের পক্ষ থেকে কুফর কাজ সংঘটিত হওয়া শর্ত?

জবাব: হ্যাঁ, অবশ্যই। শাসকের কাফের হওয়ার ক্ষেত্রে এটা শর্ত।

প্রশ্ন ৪৪: শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কখন জায়েয হবে আর কখন জায়েয হবে না?

জবাবঃ জায়েয হবে যখন আমরা তাদের থেকে প্রকাশ্য কুফরী সংঘটিত হতে দেখব এবং আমাদের নিকট তাদের মুখোমুখি হওয়ার মত ক্ষমতা থাকবে। আর আমরা তাদেরকে প্রতিহত করার মত শক্তির অধিকারী হব। আর এই বিষয়েও আমরা নিশ্চিত হতে পারব যে, আমাদের লড়াইয়ের ফলাফল রাশিয়া, আমেরিকা ও অন্য কাফের রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে যাবে না।

প্রশ্ন ৪৫ঃ যখন কোনো নির্দিষ্ট শহরের শাসনব্যবস্থা কুফরী হবে, যারা আল্লাহর শরীআহ অনুযায়ী শাসন করে না এবং আল্লাহর দীন অনুযায়ী রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে না, তাদের উপরে যেই বিধান প্রযোজ্য হবে সেই একই বিধান কি উক্ত রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের উপরেও বর্তাবে। এই যুক্তির ভিত্তিতে যে, তারা (সাধারণ নাগরিকগণ) এই কুফরী শাসনব্যবস্থার আয়ত্তাধীন অঞ্চলে বসবাস করে এবং এই যুক্তির ভিত্তিতে যে, তারা উক্ত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখার ভিত্তিতে তাদের উপরে একই বিধান প্রয়োগ করার কারণ হলো, তারা তাদের চলমান কুফরী ব্যবস্থায় বসবাস করছে সেই ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এবং আরো অন্যান্য আনুসঙ্গিক কারণসমূহ। এমন অবস্থায় কি সাধারণ নাগরিকদেরকে কাফের বলা যাবে নাকি তাদের দীন ও আকীদা সংক্রান্ত বিষয়াবলী না জানার আগ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা জায়েয আছে?

জবাবঃ যে ব্যক্তি জেনেশুনে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের অনুকরণ করল, তার প্রতিও তাদের ন্যায় একই বিধান প্রয়োগ হবে। তবে যেই জাতির ক্ষমতা তাদের আয়ত্তে নেই, যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রাখা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে শাসক কাফের হওয়ার ভিত্তিতে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না"। সূরা আল আনআম ৬:১৬৪। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন,

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"মানুষ ততটুকুই অর্জন করবে, যতটুকুর পরিশ্রম সে করেছে"। সূরা আন নাজম ৫৩:৩৯। তিনি আরো বলেন,

عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

“যে ব্যক্তি সৎকর্ম সাধন করবে, উক্ত কর্ম তারই নিজের উপকারে আসবে। আর যে ব্যক্তি অসৎকর্ম করবে, উক্ত কর্মের ক্ষতি তার উপরেই বর্তাবে”। সূরা ফুসিসলাত ৪১:৪৬।

প্রশ্ন ৪৬: কখন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে অথবা কখন শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হবে এবং কীভাবে তা সংঘটিত হবে। এর জন্য কি নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি জরূরী নাকি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা জরূরী। নাকি একদল মানুষ বিদ্রোহ করলেই হবে। শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে যেন কেউ প্রত্যাখ্যান করতে না পারে এই জন্য সমাজকে সচেতন করা কি জরূরী নাকি জরূরী নয়?

জবাব: এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তখনি করা যাবে, যখন শাসক স্পষ্ট কোনো কুফর প্রকাশ্যে সংঘটিত করবে। গণতন্ত্র অথবা সমাজতন্ত্রের দিকে আহবান করা অথবা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কোনো বিষয়কে হালাল ঘোষণা করা। সুতরাং যখন সে এমন কোনো স্পষ্ট কুফরী কাজ প্রকাশ্যে সংঘটিত করবে, তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে। আমি এই কথা বলব না: তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব। বরং এটা নির্ণীত হবে মুসলিমদের অবস্থানুসারে; যদি মুসলিমরা শক্তিশালী হয়, তার বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করার সক্ষমতা রাখে, ফিৎনা তাদের উপরে আপতিত হওয়া থেকে এবং মুসলিমদের রক্তপাত থেকে তারা নিরাপদ থাকে, তাহলে তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করাতে কোনো সমস্যা নেই।

হ্যাঁ, আর যদি বিপদ মুসলিমদের উপরেই আপতিত হওয়ার ব্যাপারে তারা সন্ত্রস্ত থাকে, তাহলে এটা একটি দুর্যোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা অনেক অনেক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছি। হারাম শরীফের জামাআতের বিদ্রোহটা ছিল একটি দুর্যোগ। অপরদিকে পাঁচ বছর বা ছয় বছর পর্যন্ত আহবানটাও ব্যর্থতায় রূপ নিয়েছিল। নুসায়রী কাফের শীআদের বিরুদ্ধে হামা শহরের সদস্যদের বিদ্রোহও এমনি দুর্যোগে পরিণত হয়েছিল। এমনিভাবে আরো যত বিদ্রোহ হয়েছে, সবগুলোর পরিণতি এমনি হয়েছে।

ঠিক তদ্রূপ মহান রব সাহাবীগণকে বিদ্রোহের অনুমতি ততক্ষণ পর্যন্ত দেননি, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে বলে মনে না করেছেন:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“যাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করা হয়েছে, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো এই কারণে যে, তাদের উপরে নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম”। সূরা আল হাজ্জ ২২:৩৯।

সুতরাং তুমি যখন নিশ্চিত হতে পারবে যে, মুসলিমদের রক্তপাত না ঘটিয়ে নিপীড়ন রুখে দেওয়ার মত ক্ষমতা তোমাদের আছে, তখন বিদ্রোহ করতে কোনো সমস্যা নেই। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

প্রশ্ন ৪৭: সাধারণ নাগরিকদেরকে সরকারের বিপক্ষে উত্তেজিত করে তোলা কি সালাফদের মানহাজ?

জবাব: না। উভয় যুগের শাসকদের অবস্থা এক নয়। আমি মনে করি যে, বর্তমান যুগের ও বনূ উমাইয়্যা আর বনূ আব্বাসের যুগের শাসকদের মাঝে বিদ্যমান তফাৎ তোমার জানা থাকা দরকার। আর ইতিহাস তোমার এই জন্য অধ্যয়ন করা দরকার, যাতে করে তাদের দ্বারা সংঘটিত অত্যধিক কল্যাণমূলক কর্মসমূহ সম্পর্কে তুমি জানতে পারো। যেই মহৎ কর্মগুলো মুসলিমদের মাঝে রক্তপাত হওয়ার আশঙ্কায় তৎকালীন শাসকদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিদ্রোহ করার অনুমতি দেয় না। আর পূর্বে যা ঘটেছে তা পরবর্তীদের জন্য একটি উপদেশ। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ফিৎনায় জড়াতে নিষেধ করেছেন। আর আমরা ইলম অন্বেষী ছাত্রদেরকে শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে নিষেধ করি। কল্যাণমূলক ইলম অর্জনের নসীহত করি। তারা যখন তাদের সিদ্ধান্তগুলোতে আলেমদের সাথে পরামর্শ করে না, তখন আমরা কেন নিজেদেরকে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করব।

আমরা অভ্যুত্থান বা আন্দোলনের দিকে কাউকে আহবান করি না। আল্লাহর শপথ! আমরা ইরাকে কোনো অভ্যুত্থান হোক এটা চাই না। যেহেতু এতে মুসলিমদের রক্তপাত ছাড়া কোনো লাভ হবে না। আমরা লিবিয়াতে কোনো অভ্যুত্থান হোক এটা চাই না। কারণ, এর বিপজ্জনক পরিণাম মিসকীনদের মাথায় এসে আপতিত হবে। এমনিভাবে আমরা সিরিয়াতে কোনো অভ্যুত্থান চাই না। যেহেতু এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি মুসলিমদেরকেই ভোগ করতে হবে।

প্রশ্ন ৪৮: এমন অনেক আহলুস সুন্নাহ জামাআতের সদস্য আছে, যারা মনে করে যে, তাৎক্ষণিকভাবে কাফের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে অস্ত্র ও শারীরিক শক্তি দ্বারা আন্দোলন করা জরূরী। যেই শাসনব্যবস্থা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসন পরিচালনা করে না- যদিও আমরা অস্ত্রবিহীন হই না কেনো। আর যখন আমরা তাদেরকে বলি, আমরা তো তাদের বিপক্ষে যথাযথ প্রস্তুতি নেইনি। আর এটা

এমন ফিৎনা, যা এর চাইতেও ভয়ঙ্কর ফিৎনার দিকে টেনে নিয়ে যায়। তখন তারা বলে, দীনকে পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার চাইতে এবং প্রকাশ্য কুফরের চাইতে অধিক বড় কোনো ফিৎনা নেই, যা বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। এই বিষয়ে আপনাদের মত কী?

জবাব: আমরা এই বিষয়গুলোতে ধীরস্থিরতা অবলম্বনের এবং মৌলিক নীতি মেনে চলার উপদেশ দিচ্ছি। আর ঈমান বাড়ে এবং কমে। যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোনো অসৎ কাজ সংঘটিত হতে দেখে, তাহলে সে যেনো স্বীয় হাত দ্বারা বাধা দেয়। যদি এতটুকু সামর্থ তার না থাকে, তাহলে সে যেনো স্বীয় যবান দ্বারা এর প্রতিবাদ করে। যদি এতটুকু সামর্থ তার না থাকে, তাহলে সে যেনো নিজের অন্তরে এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আর এটাই হলো ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল পর্যায়"। সহীহ মুসলিম হা/৪৯।

সুতরাং কারো ঈমান যদি শক্তিশালী হয় আর সে কাফেরদের ব্যাপারে কোনো কাজ তাৎক্ষণিক সংঘটিত করে, তাহলে তাকে ভর্ৎসনা করা উচিত নয়। আর যার ঈমান দুর্বল, সে ধীরস্থিরতা অবলম্বনকেই অধিক উত্তম মনে করেছে। তাকেও ভর্ৎসনা করা উচিত নয়।

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মক্কা বিজয়কে বিলম্বিত করেছেন সেখানে বিদ্যমান কিছু মুসলিম বাসিন্দাদের কারণে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَـُٔوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا۟ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"যদি মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারীগণ (মক্কায় কাফিরদের মাঝে) না থাকত এবং তাদেরকে তোমরা না চেনার কারণে আঘাত করবে এবং অজ্ঞতামূলক আচরণের ফলে তোমাদের উপরে কলঙ্ক লেপন করা হবে এমন সম্ভাবনা না থাকত, তাহলে তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হত। যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি এই জন্য, যাতে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারেন। যদি তারা (মক্কার মুসলিমগণ) তাদের (মক্কার কাফির) থেকে পৃথক

অবস্থানে থাকত, তাহলে আমরা অবশ্যই তাদের মধ্যে কাফেরদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করতাম ”। সূরা আল ফাতহ ৪৮:২৫।

আর সংবাদমাধ্যমগুলো যেকোনো সময় বিতাড়িত শয়তানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম। যাদের প্ররোচনায় জাতি ও সমাজ দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে বৈধ মনে করে। আর তখনি মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আর তাগূতী শক্তিগুলো তাদের গবেষণা ও এজেন্ডা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সুতরাং মুসলিমদের মাঝে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা জরুরী। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

প্রশ্ন ৪৯: আমরা কেনো দলীলের ভিত্তিতে শাসকবর্গের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দেই না বিশেষ করে ঐ সকল শাসকের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না?

জবাব: প্রকৃতপক্ষে জিহাদ হলো ইসলামের অন্যতম একটি সর্বোচ্চ নিদর্শন:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও সম্পদসমূহ ক্রয় করে নিয়েছেন এই মর্মে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে হত্যা করে এবং নিহত হয়”। সূরা আত তাওবা ৯:১১১। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

“যে ব্যক্তি যুদ্ধ করেনি এবং তার অন্তরেও যুদ্ধের চেতনা জাগ্রত হয়নি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে মুনাফিক্বীর একটি শাখার উপর মৃত্যুবরণ করল”। সহীহ মুসলিম হা/১৯১০।

প্রকৃতপক্ষে কিছু মুসলিম শাসকদের মাঝে দীনের কিছু অংশ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। যাদের কোনো কুফরী কর্মকাণ্ড এখনো প্রকাশিত হয়নি। যদি তাদের কুফরী কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হয়, তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐ বাণীটিই প্রযোজ্য হবে, যা তিনি উবাদাহ ইবনুস সামিত এর হাদীছে বলেছেন,

بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ

تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ .

“আমারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আহবানে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করলাম এই মর্মে যে, সুখে-দুঃখে, স্বচ্ছলতা-দারিদ্রাবস্থায় তাঁকে মান্য করা হবে ও আনুগত্য করা হবে। আর আমরা ক্ষমতাসীন শাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়াব না। তবে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কোনো সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সাব্যস্ত প্রকাশ্য কোনো কুফর যদি তোমরা দেখতে পাও, তাহলে সেটা ভিন্ন বিষয়। আর আমরা যেখানেই থাকি না কেনো, সত্য কথা বলতে আল্লাহর ব্যাপারে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করব না”। সহীহ মুসলিম হা/১৭০৯।

যদি শাসকের কুফরী প্রকাশিত হয়ে যায়, তাহলে মুসলিমদের অবস্থা ও জাতির অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা জরূরী। যেহেতু এমন ক্ষেত্রে বিপদ জাতির উপরেই এসে পড়ে। আর মুসলিমগণ কি জিহাদ করার উপযুক্ত নাকি উপযুক্ত হয়নি? বরং তারা সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আর রুটির পরিমাণ স্বল্প হয়ে গেলে এক টুকরা রুটির কারণে প্রধান শাসককে গালি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আমাদের জনৈক মিসরীয় জ্ঞানী ভাইয়ের কথা আমাকে অবাক করে দেয়, আমি তার নাম এখানে উল্লেখ করতে চাই না। তিনি কোনো এক আলোচনায় বললেন, তুমি কি সাদাতকে কাফের মনে কর? তোমরা আমাকে ছাড়া আর কাউকে সাদাতকে কাফের বলতে দেখনি। তোমরা রুটির লাইনের কাছে গেলে সেখানে মানুষদেরকে বলতে শুনবে, নিশ্চয় সাদাত একজন কাফের। সুতরাং সাধারণ জনগণ যদি রুটি, মিষ্টান্ন ও পাটশাঁকের স্যুপের যোগান যদি কমে যায়, তাহলে তারা সরকার প্রধানকে কাফের বলার জন্য প্রস্তুত থাকে। আর যদি তাদের প্রয়োজন পূরণ করা হয়, তাহলে তারা বলবে, এই শাসক হলেন খলীফা রাশিদ।

এরপরে ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। এমন যেনো না হয় যে, আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম আর মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত হলো, কিন্তু ক্ষমতার আসনে বসল কোনো কমিউনিস্ট অথবা বাথ মতবাদের অনুসারী অথবা কোনো ধর্মনিরপেক্ষবাদী ব্যক্তি।

আমরা যখন জামিআ আল ইসলামিয়াতে অধ্যয়নরত ছিলাম, তখন আমার এক সহপাঠী ছিলেন। যিনি আবিসিনিয়ার নাগরিক। তার নাম হলো মুহাম্মাদ। আমি তাকে বললাম, মুহাম্মাদ! তুমি এই ছুটিতে কী করবে বলে মনস্থ করেছ? সে বলল, আমরা স্বৈরাচারের বিপক্ষে আন্দোলন শুরু করেছি। তাদের শহরে খ্রিস্টানরা বসবাস করত। এরপরে তারা তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিলো এবং

তাড়িয়ে দিলো। এর কিছুদিন পরেই আবিসিনিয়া একটি রেড কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হলো।

আমি এই বিষয়ে খুবই আফসোস করি যে, কমিউনিস্টরা অথবা বাথ পার্টির অনুসারীরা অথবা নুসায়রীয়রা আমাদের দ্বারা আন্দোলন পরিচালনা করে আমাদের দাঁড়ি দেখে হাসে। ব্রিটিশদেরকে আদ্ন থেকে যারা বিতাড়িত করেছে, তারা মুসলিম ছিল। কিন্তু ক্ষমতার মসনদে বসেছে কমিউনিস্ট পন্থিরা। যারা জামাল আব্দুন নাছের – আল্লাহ তার প্রতি রহম না করুন – এর ক্ষমতার পথ সুগম করেছে এবং তার ক্ষমতাকে জোরদার করেছে তারাও মুসলিম। এরপরে সে তাদেরই সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমেরিকার এজেন্ট ইরানের দোসর সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী – যার মাঝে সকল প্রকার অনিষ্ট বিদ্যমান – এর জন্য যারা পথ সুগম করেছে, তারা হলো প্রায় দেড় মিলিয়ন মুসলিম। আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন। তাদের পরিণতি তাদের নিয়্যাতের উপরে নির্ভরশীল। আমরা আশা রাখি, আল্লাহ তাদেরকে শাহাদতের সোভাগ্যমণ্ডিত করবেন। যেহেতু তারা তাদের নিয়্যাতের উপরে অটল ছিলেন।

আমরা এই বিষয়টির খোঁজও রাখি না যে, স্বয়ং আমেরিকাও দাঁড়িওয়ালাদেরকে উস্কানি দেয় এবং তাদেরকে বলে, দেখো, এই প্রেসিডেন্টের অবস্থা কেমন। সে কী পরিমাণ বেপরওয়া হয়ে জাতির সম্পদে হস্তক্ষেপ করছে। কীভাবে অরাজকতার দরজার উভয় পাল্লা খুলে রেখেছে। আল্লাহর হারামকৃত বিষয় কীভাবে বৈধ করে নিয়েছে। জাতিকে এমনভাবে বয়কট করে রেখেছে যেনো জাতি তার কাছে বন্দি। এভাবে তারা উস্কানি দিয়ে তার চেয়েও নিকৃষ্ট শাসককে তার স্থানে নিয়ে আসে। এরপরেও যদি তারা আন্দোলনে না নামে, তাহলে আমেরিকার ডলার চতুষ্পদ জন্তুর মলের ন্যায় ছিটানো হয়। তখন তারা মুর্খ লোভী লোকগুলোর জন্য একশ মিলিয়ন পরিমাণ সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হয়। তাদের জন্য যাদেরকে তারা চায়। এরপরে তারা নিজেদের জন্য তাদের চাহিদামত বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে বাছাই করে নেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ

"তোমরা জালেমদের দিকে ধাবিত হয়ো না, তাহলে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে"। সূরা হুদ ১১:১১৩। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ

“মুমিন একই গর্তে দুইবার দংশিত হয় না”। ইবনে মাজাহ হা/৩৯৮২।

আমরা কিছু ইট-পাটকেল ছুঁড়ে পরিতৃপ্ত হয়ে গিয়েছি। এরপরে নতুন ইশতেহার আর ঘোষণা আসলে আবার আমরা বলছি, হয়ত এরা সত্যবাদী হবে। এরপরে আমরা অধিক সংখ্যক ইসলামী দেশগুলোর ন্যায় পরিস্থিতি তৈরী না হওয়া পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না।

যদি মুসলিমরা উপযুক্তই হতো, আর তাদের নিকট সুখে ও দুঃখে, কষ্টে, অনাহারে, বস্ত্রহীন অবস্থায়, অনিদ্রা ও ক্লান্তির সময় ধৈর্য ধারণের মত ব্যক্তিত্বশীল পুরুষগণ থাকত এবং আমেরিকার ডলারকে প্রত্যাখ্যান করতে পারত, তাহলে তারা হতো হারূত মারূতের চেয়েও বড় জাদুকর। সুতরাং প্রথম কাজই হলো আল্লাহর নিকট আমেরিকান ডলার প্রত্যাখ্যান করার অঙ্গীকার করা। অন্যথায় তারা কখনোই সফল হতে পারবে না।

আর যে বলে, আহলুস সুন্নাতের সদস্যরা জিহাদে উপস্থিত থাকে না। সে একজন জেদী ব্যক্তি। আহলুস সুন্নাহ অবশ্যই জিহাদের মাঝে অবস্থান করছে। আল্লাহর পথের দাওয়াত চলমান। তা'লীম চলমান। যথাসাধ্য অসৎকাজে বাধা দেওয়ার অভিযান, অন্যায়-কুসংস্কারের সাথে লড়াই, অনৈতিক সংগঠনগুলোর সাথে লড়াই, কমিউনিস্টদের সাথে লড়াই, বাথ মতবাদের অনুসারী ও নুসায়রীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ চলমান। তারা তো গোটা সমাজের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে আছে। আর এটা শত্রুদের দিকে তোপ-কামান আর মেশিনগান তাক করার চেয়েও ভয়ঙ্কর।

আমরা এমনও কিছু দল দেখেছি, যারা নীতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। যারা বিশ হাজার সংখ্যক আল্লাহর পথের দাঈ ও নিরীহ মুসলিমদেরকে কয়েদি বানিয়েছে। সুতরাং বিচক্ষণতার সাথে আমাদের জন্য নিজেদের চেতনাবোধকে জাগ্রত করে প্রেক্ষাপটকে বুঝা অত্যন্ত জরূরী।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা নবুওতের দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকেই কি তিনি জিহাদের আদেশ দিয়েছেন? নাকি তিনি স্বীয় সাহাবীকে মার খেতে দেখেও তাকে অতিক্রম করে চলে যেতেন। আবার কখনো নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম — যেমনটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে — হারামের সীমানায় নিজেও মার খেয়েছেন। এরপরে তিনি হিজরত করা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করেন। হিজরতের পরে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করা পর্যন্ত তিনি ধৈর্যধারণ করেন:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“যাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করা হয়েছে, তাদেরকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি এই জন্য দেওয়া হলো যে, তাদের প্রতি জুলম করা হয়েছে”। সূরা আল হাজ্জ ২২:৩৯।

সুতরাং আমাদেরকে দৃঢ় হতে হবে। আমরা আমাদের নেতৃত্বের লাগাম ধোঁকাবাজদের হাতে দিব না। নিঃস্ব-দেওলিয়া ভাইয়েরা যেভাবে তাদের অনুসারীদের সঙ্গে প্রতারণা করে, আমরা সেভাবে আমাদের অনুসারীদের সঙ্গে প্রতারণার আশ্রয় নিব না। তারা বলে, জিহাদ চাই, জিহাদ চাই। এরপরে তারা যুবসমাজকে এমনভাবে উস্কানি দেয়, যেনো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রস্তুতি নিতে নিতে তাদের চুল দাঁড়িয়ে গেছে। এরপরে তারা তাদেরকে অভিনয়, সঙ্গীত ও কৌতুক ও এই জাতীয় বিষয়ের দিকে ঠেলে দেয়। সুতরাং আমাদের জন্য আমাদের ভাইদেরকে ও অনুসারীদেরকে আমরা ধোঁকায় ফেলে রাখতে পারি না:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে”। সহীহ বুখারী হা/৮৯৩।

প্রশ্ন ৫০: মিম্বারের উপরে বসে কোনো দলীল ছাড়াই শাসকদের উপরে আক্রমণাত্মক শব্দের ব্যবহার এবং তাদেরকে কাফের বা ফাসেক্ব আখ্যা দেওয়া কি সালফে সালিহীন এর মানহাজ ছিল?

জবাব: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“তোমাদের মাঝে কেউ যদি কোনো অপরাধ (সংঘটিত) হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা বাধা দেয়। যদি এটা করার সামর্থ তার না থাকে, তাহলে সে যেন নিজের যবান দ্বারা বাধা দেয়। আর যদি এটা করার সামর্থ তার না থাকে, তাহলে সে যেন নিজ অন্তর দ্বারা এই অপরাধের ঘৃণা করে। আর এটা হলো ঈমানের সর্বনিম্নস্তর”। সহীহ মুসলিম হা/৪৯।

তবে শাসককে নসীহত করার ব্যাপারে বর্ণিত এই হাদীসটি দুর্বল:

مَنْ كَانَتْ لَهُ نَصِيْحَةٌ لِذِيْ سُلْطَانٍ فَلْيَنْصَحَهُ سِرًّا

“যদি কারোর কাছে শাসককে নসীহত করার মত কথা থাকে, তাহলে সে যেনো তাকে গোপনে নসীহত করে”।

সকল রাষ্ট্রেই গণবিপ্লবের সমস্যাটি বিদ্যমান। আমরা কোনো গণবিপ্লব চাই না। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আন্দোলন আর অভ্যুত্থানের দিকে মানুষকে আহবান করা যাবে না। যদি এমন কোনো অপরাধ সংঘটিত হতে দেখ, তাহলে সেটাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পার। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকে তুমি তাগূতী শাসনতন্ত্র বলতে পার। যখন সানআতে বামপন্থীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো আর সকল পদ তাদেরকে হস্তান্তর করা হলো, তখন আমরা বললাম, হে সানআ সরকার, আপনি ভুল করেছেন। এমনিভাবে নির্বাচনী দলগুলোর অবস্থাও একই। কিন্তু আমরা কোনো আন্দোলন বা অভ্যুত্থানের পক্ষে নই। বরং আমরা যদি কোনো দলের প্রধান সম্পর্কে এটা জানতে পারি যে, তিনি মুসলিমদের রক্ত প্রবাহের দিকে আহবান করছেন, তাহলে আমরা তারই বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান করার পক্ষে বলি। গণবিপ্লব আর অভ্যুত্থান দিয়ে উম্মাহর কী অর্জন হয়েছে?

সুতরাং সমস্যা হলো শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের মাঝে। অপরিণামদর্শী যুবককে অবশ্যই স্থির রাখতে হবে। যদি তুমি কোনো অপরিণামদর্শী যুবককে দেখ, তাহলে তুমি তার ভালোবাসাকে শীতল করে দাও। তাকে উপশমিত করো। তাকে শান্ত করো। তারাই হলো দাওয়াতের অবনতির কারণ। সুতরাং আলোচনার মর্ম খুবই স্পষ্ট। কোনো অপরাধ ঘটতে দেখলে বাঁধা দাও। কিন্তু কোনো অভ্যুত্থান ও আন্দোলনের ডাক দিও না।

প্রশ্ন ৫১: জালিম শাসকের জন্য দুআ করার বিধান কী?

জবাব: জালিম শাসকের জন্য দুআ করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যদি এই জালিম শাসকের মৃত্যুতে দুনিয়া ফিতনায় ছেয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে উক্ত জালিম শাসকের জন্য দুআ করতে কোনো সমস্যা নেই অথবা যদি তার ভয়ে ইসলামের শত্রুরা মুসলিম রাষ্ট্রে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে এবং তার মৃত্যুতে তারা ইসলামী রাষ্ট্রে আক্রমণ করবে এমন আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার জন্য দুআ করাতে কোনো সমস্যা নেই।

কিন্তু যদি জাতির উপরে শাসকের জুলমের অবস্থা এমন হয়, যেমনটা আমাদের যুগের শাসকদের অবস্থা, তাহলেও এই বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা জরূরী। যেহেতু এমন অনেক শাসক আছেন, যাদের অনিষ্টতা ও অনাচার গণবিপ্লব, অভ্যুত্থান এবং রাষ্ট্র অরাজকতার আগুনে জ্বলে যাওয়া থেকে উত্তম। যে মানুষকে ফিতনার দিকে আহবান করে অথবা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতি উস্কে দেয়, আমি তাকে ভ্রান্ত বলে মনে করি। কারণ এটা কখনো ভয়ানক ফিতনার জন্ম দিতে পারে। সুতরাং সবচেয়ে উত্তম হলো মানুষ আল্লাহর দীনের জ্ঞান আগে অর্জন

করবে। যখন মানুষ আল্লাহর দীন সম্পর্কে জানতে পারবে, তখন তারাই নিজেদের থেকে এমন শাসককে প্রত্যাখ্যান করবে।

যেমন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং তার পিতা একদা এক বর্ণনাকারীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল। যিনি মানুষদের সামনে আবূ বকর ও উমার এর সীরাত নিয়ে আলোচনা করছিল। সেই মুহূর্তে হাজ্জাজ বলল, যদি আমার ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি তাকে হত্যা করে দিতাম। তখন তার পিতা – তার পিতা একজন সৎ মানুষ ছিলেন – বললেন, আমি তোমাকে হতভাগা ছাড়া কিছুই মনে করি না। মানুষকে উপদেশ দানকারী একজন ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি এমন কথা বলছ, যদি তোমার ক্ষমতা থাকত, তাহলে তুমি তাকে হত্যা করতে। তখন সে বলল, উক্ত বর্ণনাকারী মানুষের সামনে আবূ বকর ও উমার এর জীবন চরিত্র নিয়ে আলোচনা করছে। যদি তারা আবূ বকর ও উমার এর সীরাত সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে তারা আমীরুল মুমিনীন এর প্রতি রাগান্বিত হয়ে উঠবে।

সুতরাং আমি বলব, গণবিপ্লব ও অভ্যুত্থানের পূর্বে প্রথমে মানুষকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। আর গণবিপ্লব ও অভ্যুত্থানের দিকে আহবানকারী আসলে অরাজকতার পথে আহবানকারী। মুসলিমদের রক্ত প্রবাহের পথে আহবানকারী। এমনকি যেই শাসককে আমি কাফের বলে বিশ্বাস করি, তার ব্যাপারেও আমার মত হলো: লোহা ও আগুন নিয়ে তার সাথে সংঘর্ষে নামা উচিত নয়। এই সংঘর্ষ মিসকীনদের ক্ষতি ও মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। এতে এই পক্ষ ও ঐ পক্ষ উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হবে। সুতরাং পরস্পর একে অপরকে কল্যাণের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। ইলম ও তা'লীমের প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত। আল্লাহই একমাত্র সহায়।

প্রশ্ন ৫২: كفر دون كفر "আল্লাহর নাযিলকৃত আইন বাদ দিয়ে অন্যকোনো আইন দ্বারা সিদ্ধান্ত দেওয়া ছোট কুফর বলে বিবেচিত হবে?"

জবাব: ইবনু আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহুর এই বক্তব্য ঐ শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেই শাসক শরীআতের আইন দ্বারা কখনো কোনো বিচার করে না। এমন শাসক যদি জাহেল না হয়ে থাকে, তাহলে সে কাফের বলেই বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন ৫৩: এমন স্পষ্ট কুফরের প্রকৃত ব্যাখ্যা কী, যা দ্বারা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জরুরী হয়ে যায়?

জবাব: এই ক্ষেত্রে স্পষ্ট কুফরী কর্ম হলো যেমন, আমেরিকা অথবা রাশিয়া থেকে আইন ধার করে নিয়ে এসে সেগুলোকে ইসলামী আইনের মর্যাদা দেওয়া। অথবা সুদকে বৈধ মনে করা অথবা ব্যভিচার অথবা মদপানকে বৈধতা প্রদান করা। এটাকে স্পষ্ট কুফরী হিসেবে বিবেচনা করা যায়। অবশিষ্ট থাকল এই প্রশ্নটি যে, শাসককে কাফের বলা যাবে নাকি এই কাজটিকে কুফর বলা হবে? আর শাসকের ব্যাপারে আমরা ইতোপূর্বে (শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কখন করা যাবে) এই বিষয়ের আলোচনায় বলে এসেছি। এই শর্তগুলো পাওয়া গেলে তাকে কাফের বলা যাবে: শাসকের ইসলামী আইন সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। শাসককে এই আইন স্বেচ্ছায় মানতে হবে, অন্যের জবরদস্তিতে নয়। শাসককে এটা বিশ্বাস করতে হবে যে, এই আইন ইসলামী আইনের সমমানের অথবা তার চাইতে ভালো। এখন প্রশ্নকারী ভাইয়ের বক্তব্য অনুসারে যদি এই শর্তগুলো পাওয়া যায়, তাহলে কি শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য এটা যথেষ্ট হবে?

হ্যাঁ, হবে যদি মুসলিমদের তা করার মত সামর্থ থাকে এবং রক্তপাত না ঘটিয়ে তারা যদি এটা সম্পন্ন করতে পারে। আর যদি তারা কোনো ভয়ঙ্কর ফিতনার আশঙ্কা করে অথবা তাদের সেই পরিমাণ সামর্থ না থাকে, তাহলে বিদ্রোহ ওয়াজিব নয়। বরং তখন বিদ্রোহ অবৈধ, যখন সেই বিদ্রোহ মুসলিমদের ধ্বংসের কারণ হবে।

প্রশ্ন ৫৪: জনৈক নারী প্রজাতান্ত্রিক ইন্দোনেশিয়াতে ক্ষমতা লাভ করেছে। তাহলে এখন কি তার আনুগত্য করা বৈধ হবে?

জবাব: না, এমন নারীর কোনো আনুগত্য নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তোমাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আনুগত্য করো"। (আন নিসা: ৫৯)। তিনি আরো বলেন,

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

"তোমরা সীমালংঘনকারীদের আদেশের আনুগত্য করো না। যারা যমীনে অরাজকতা সৃষ্টি করে। মীমাংসা করে না"। (আশ শু'আরা: ১৫১-১৫২)।

প্রশ্ন ৫৫: মিম্বারে বসে অথবা সাধারণ দারসসমূহে শাসকদের সমালোচনা করা কি সালাফদের মানহাজ?

জবাব: আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহাগ্রন্থে বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মাঝে যেনো এমন একটি দল থাকে, যারা কল্যাণের পথে (মানুষদেরকে) আহবান করে। সৎকাজের আদেশ প্রদান করে এবং অসৎকাজে নিষেধ করে। তারাই প্রকৃত সফল ব্যক্তি"। সূরা আলে ইমরান ৩:১০৪।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

"সর্বোত্তম জিহাদ হলো শাসকের সম্মুখে ন্যায় কথা বলা"। সহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৪০১১।

আর (عند) সম্মুখে শব্দটিতে গোপনীয়তা ও একাকী শাসকের সঙ্গে অবস্থান করার অর্থকে সমর্থন করে না। বরং এই শব্দটিতে প্রকাশ্যে উপস্থিতির দাবি পাওয়া যায়।

মিম্বারে বসে শাসকের কিতাব সুন্নাহ বিরোধী কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করার মাঝে আর তার বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কানি দেওয়ার মাঝে পার্থক্য আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্পষ্ট কুফরী না দেখতে পাব, ততক্ষণ পর্যন্ত উস্কানি দেওয়া জায়েয হবে না। যেমনটি উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

"আমারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বায়আত গ্রহণ করলাম এই মর্মে যে, আমরা স্বচ্ছলতা-দারিদ্রাবস্থায় সুখে-দুঃখে, তাঁকে মানব ও তার আনুগত্য করব। তাঁকে সর্বাবস্থায় আমাদের স্বার্থের উপরে প্রাধান্য দিতে হবে। আর আমরা ক্ষমতাসীন শাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়াব না। তবে তোমাদের

নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কোনো সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সাব্যস্ত প্রকাশ্য কোনো কুফর যদি তোমরা দেখতে পাও, তাহলে সেটা ভিন্ন বিষয়। আর আমরা যেখানেই থাকি না কেনো, আল্লাহর ব্যাপারে সত্য কথা বলতে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করব না"। সহীহ মুসলিম হা/১৭০৯।

আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ যার রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে সত্য কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন, যদিও তা তিক্ত হয়। (মুসনাদে আহমাদ)। যেভাবে তাকে তিনি কোনো হাবশী গোলাম আমীর হলেও তার আনুগত্য ও তাকে মান্য করতে আদেশ দিয়েছেন। তাই আবূ যার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উভয়টিই মেনে চলতেন। তিনি উসমান (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর আদেশের আনুগত্য করেছেন এবং তাকে মান্য করেছেন।

সুতরাং যদি আমরা স্পষ্ট কুফর দেখতে পায়, তাহলে কি বিদ্রোহ করা ওয়াজিব হবে?

তখন মুসলিমদের সামগ্রিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। তাদের নিকট কি স্পষ্ট এই কুফরের সঙ্গে লড়াইয়ের মত শক্তি আছে নাকি তারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করার প্রয়াস নিচ্ছে? তাদের নিকট কি স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে। নাকি তারা আমেরিকা ও অন্যান্য বৈদেশিক সরকারের নিকট নিজেদের হাত প্রসারিত করবে। যার ফলে তারাও মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত হতে দিবে। এরপরে তারা প্রথম সেক্যুলারপন্থী শাসকের পরিবর্তে অন্য আরেকজন সেক্যুলারপন্থী শাসককে তাদের উপরে চাপিয়ে দিবে। অথবা সেক্যুলারপন্থীর পরিবর্তে কমিউনিস্ট শাসককে চাপিয়ে দিবে। অথবা মুসলিম শাসকের পরিবর্তে একজন খ্রিস্টান শাসককে চাপিয়ে দিবে। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক সামর্থ থাকা জরূরী।

এরপরে দৃষ্টিপাত করতে হবে এই বিষয়ের প্রতি যে, তারা কি যুদ্ধের যাবতীয় শক্তির প্রস্তুতি নিয়েছে কি-না। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সমান শক্তির অধিকারী হওয়া জরূরী নয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহাগ্রন্থে বলেছেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"তাদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য সাধ্যমত শক্তি ও অশ্ববাহিনী সর্বদা প্রস্তুত করে রাখো। যাতে করে এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভীতি প্রদর্শন করতে পার"। সূরা আল আনফাল ৮:৬০।

যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যেই পরিমাণ ডাক্তার ও হাসপাতালের প্রয়োজন হয়, সেগুলোর ব্যবস্থা কি তারা করে রেখেছে। নাকি কোনো আহত ব্যক্তির রক্ত ক্ষতস্থান থেকে গড়িয়ে পড়তে পড়তে সে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত তাকে তারা তার অবস্থার উপরেই ছেড়ে দিবে। এমনিভাবে যুদ্ধের মাঝে খাবারের প্রয়োজন আছে। বর্তমানে মানুষ সেই পরিমাণ ধৈর্যধারণের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠেনি, দুর্বল অবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, জন্মস্থান পরিত্যাগ করা, অসুস্থাবস্থায় ও দারিদ্রাবস্থায় যেমন ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। যখন তারা মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলেন। বর্তমান যুগের মানুষের প্রয়োজন সাহাবা – রদ্বীয়াল্লাহু আনহুম – এর সেই পদ্ধতি অনুসারে নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলা।

সুতরাং কোনো ব্যক্তির হক্ব কথা বলার মাঝে আর শাসকের বিরুদ্ধে মানুষকে বিদ্রোহের উস্কানি দেওয়ার মাঝে বিদ্যমান পার্থক্য স্পষ্ট হলো, আর হক্ব কথা হলো শাসকগণ নিজেদেরকে কলুষিত করে ফেলেছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ

"যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না"। সূরা আল হাজ্জ ২২:১৮।

সুতরাং আমরা শাসকদেরকে নসীহত করছি, তারা যেনো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পথে ফিরে আসেন। তারা যেনো নিজ নিজ জাতির সঙ্গে সদাচরণ করেন। আর আমি আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে শাসককে নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়ানো পছন্দ করি না। আমরা তার নিকট মাছির চেয়ে বেশী কিছু না। সুতরাং তাদের নিকট আমাদের কোনো মূল্য নেই।

কুয়েতের যুবসমাজের প্রতি আমার নসীহত হলো, তারা যেন নিজেদেরকে কল্যাণময় ইলম অর্জনে, আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার মাঝে ব্যস্ত রাখে। আর এই জাতীয় কুমন্ত্রণা ও ভুল চিন্তা ধারা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখে। ইসলাম কখনো অভ্যুত্থান ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

প্রশ্ন ৫৬: এটা কি বিশুদ্ধ যে, আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ইয়াযীদ ইবনু মুআবিয়া এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন এবং এই ঘটনা দ্বারা যারা বিদ্রোহের পক্ষে দলীল পেশ করে তাদের জবাব কী হতে পারে?

জবাবঃ ইয়াযীদ ইবনু মুআবিয়ার বায়আত আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ তথা যোগ্য ও অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দের সম্মতিতে হয়নি। আমার কাছে এই বিষয়টি খুবই আশ্চর্য লাগে, যখন মুআবিয়াকে জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়াযীদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তখন তিনি বললেন, আমি হক্ব কথা বলতে যেয়ে তোমাদেরকে ভয় পাচ্ছি। আর মিথ্যা কথা বলতে যেয়ে আল্লাহকে ভয় করছি। তাই আমি এই ব্যাপারে চুপ থাকব, কোনো কথাই বলব না।

যারা এই বায়আতকে অস্বীকার করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আব্দুর রহমান বিন আবূ বকর আস সিদ্দীক। তিনি বলেছেন, এটা কায়সারদের বায়আত। অর্থাৎ তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ্য শাসনের ক্ষমতা লাভ করেছে। আর মুসলিমরা উপযুক্ত ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করেন। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ ইয়াযীদ ইবনু মুআবিয়ার ব্যাপারে বলেছেন, আমরা তাকে ভালোবাসি না এবং তাকে গালিও দেয় না। আর যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, সে একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু তার অপরাধ কুফরের সীমায় পৌঁছেনি।

তার বিরুদ্ধে কিছু মহান সাহাবী বিদ্রোহ করেছিলেন, যারা তার চেয়ে হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তবে আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বিদ্রোহের ঘটনায় তাদের (বর্তমানের বিদ্রোহীদের) পক্ষে কোনো দলীল নেই। যেহেতু সে (ইয়াযীদ) অসংখ্য নিষিদ্ধ কর্ম কাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিল। তথাপি বিদ্রোহ না করে ধৈর্যধারণ করাটা অবশ্যই অধিক উত্তম ছিল।

প্রশ্ন ৫৭: শাসকদের এমন অবস্থানের বিপরীতে মুসলিম জাতির আবশ্যক করণীয় কী?

জবাবঃ তাদের জন্য জরুরী করণীয় হলো, তাদেরকে নসীহত করা। তবে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে ইসলাম ও মুসলিমদের কোনো কল্যাণ নেই। সহীহাইনে উবাদাহ ইবনুস সামিত রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

“আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বায়আত গ্রহণ করলাম এই মর্মে যে, আমরা স্বচ্ছলতা-দারিদ্রাবস্থায় সুখে-দুঃখে, তাঁকে মানব ও তার আনুগত্য করব। তাঁকে সর্বাবস্থায় আমাদের স্বার্থের উপরে প্রাধান্য দিব। আর আমরা ক্ষমতাসীন শাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়াব না। তবে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কোনো সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সাব্যস্ত প্রকাশ্য কোনো কুফর যদি তোমরা দেখতে পাও, তাহলে সেটা ভিন্ন বিষয়। আর আমরা যেখানেই থাকি না কেনো, আল্লাহর ব্যাপারে সত্য কথা বলতে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করব না”। সহীহ মুসলিম হা/১৭০৯।

উদাহরণস্বরূপ: এমন শিক্ষাব্যবস্থা, যা ছাত্রদের অথবা মুসলিমদের প্রচুর সময় নষ্ট করছে। তাদের উচিত, তারা শাসকদের নিকট মাসজিদসমূহে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার আবেদন জানানো। মাসজিদসমূহে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবেশ তৈরী করার আবেদন জানানো। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

"যখন কোনো জাতি আল্লাহর কোনো ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং পরস্পর একে অপরের সঙ্গে তা নিয়ে মনোযোগের সহিত আলোচনা করে, তখন তাদের উপরে শান্তি নাযিল হয়। তাদেরকে ফেরেশতাগণ চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে রাখে। আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবৃত করে রাখে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট উপস্থিত বান্দাদের (ফেরেশতাগণ) সামনে তাদের আলোচনা করেন"। সহীহ মুসলিম হা/২৬৯৯।

মিডিয়াও এমন হওয়া উচিত; তথ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীও একজন মুসলিম আলেম হওয়া জরূরী। প্রত্যেক রাষ্ট্র একজন মুসলিম আলেমকে এই দায়িত্বে নিয়োগ দিবে। যেহেতু মিডিয়া হলো জাতির মুখপাত্র। যদি মিডিয়ায় সংবাদ পরিবেশনকারী ও বেতারঘোষকের ব্যাপারে কোনো আস্থা না থাকে, তাহলে মিডিয়ার দ্বারা কী উপকার হবে? এমনিভাবে রিপোর্টার ও লিপিকারদের জরূরী কর্তব্য হলো মুসলিমদের রাষ্ট্রসমূহকে নিকৃষ্ট গ্রন্থসমূহের জাল থেকে রক্ষা করা, জাতিকে অতিরিক্ত শুল্ক, কাস্টম ভ্যাট ও সুদী ব্যাংকগুলোর ফাঁদ, নারীদের প্রকাশ্য রূপচর্চা, পর্দাহীনতা ও পুরুষ নারীর অবাধ মেলামেশায় জড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করা। এমন প্রতিটি বিষয় থেকে জাতিকে রক্ষা করা, যেগুলোকে ইসলাম সমর্থন করে না। বরং সকল মুসলিমের উপরে ওয়াজিব হলো অভ্যুত্থান, আন্দোলন ও অরাজকতা সৃষ্টি না করে শাসকদের এই জাতীয় কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করা। কিন্তু তাদের জন্য ততটুকু পরিমাণ বিরোধিতা করাই শ্রেয় হবে, যতটুকু করার সামর্থ তারা রাখে। আল্লাহই একমাত্র আশ্রয়স্থল।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত কিতাবসমূহ

১. কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২. শারহুস সুন্নাহ-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৩. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৪. আকীদাতুত তাওহীদ
-ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৫. আল ইরশাদ- সহীহ আকীদার দিশারী (ঈমানের মূলনীতির ব্যাখ্যা)
- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা]

৬. আল ওয়াসীয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৭. আল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৮০ টাকা]

৮. শারহুল আকীদা আল ওয়াসিতীয়া
-ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৯. শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ
- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১০. শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া প্রথম খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

১১. শারহুল আকীদা আত-তহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

১২. নবী-রসূলগণের দাওয়াতের মূলনীতি
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৩. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৪. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৫. কিয়ামতের সহীহ আলামত- শাইখ ইসাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৬. ফিকহুল খিলাফাত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১৭. ইসলামী রাজনীতি বিষয়ক ফতোয়া

-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১৮. ফিকহের মূলনীতি (আল উসূল মিন ইলমিল উসূল)

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

১৯. হাদীস আকীদা ও ফিকহের স্বতন্ত্র দলীল

- মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ [নির্ধারিত মূল্য: ১৫০ টাকা]

২০. মুখতাসার কিতাবুত তাওহীদ

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমাহ [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২১. মানহাজ-কর্মপদ্ধতি

- ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২২. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদার নিরসন

- ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

২৩. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৪. ইজতিহাদ ও তাকলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২৫. ফায়সালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

২৬. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৭. উমদাতুল আহকাম

- ইমাম হাফেয আব্দুল গনী আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২৮. তাওযীহু উসূলিল ফিকহ আলা মানাহাজি আহলিল হাদীস
-যাকারীয়া ইবনে গুলাম কাদীর [নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ টাকা]

২৯. আন নাবযাতুল কাফীয়া ফী আহকামি উসূলিদ দীন-দীনের মূলনীতি

- ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩০. আদ-দুরারুল বাহীয়াহ ফিল মাসাঈলিল ফিকহিয়াহ

- মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৩১. নতুন চাঁদের মাসআলা

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩২. তাহসীলুল মামূল মিন ইলমিল উসূল

-আল্লামা সিদ্দিক হাসান খাঁন [নির্ধারিত মূল্য: ১৫০ টাকা]

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত দাওয়াতী রিসালাসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাসের ইবনে আব্দুল করীম আল-আকল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩. ইসলামী আকীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৪. আকীদা আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর

-আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাআলান [নির্ধারিত মূল্য: ৪০ টাকা]

৫. আহলুল হাদীসদের আকীদা-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

৬. উসূলুস সুন্নাহ-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৭. লুমআতুল ইতিকদ-আকীদার ঝলক

-ইবনে কুদামা আল-মাকদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৮. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৯. আল আকীদা আত-তহাবীয়া

- ইমাম আবূ জাফর আহমাদ আত-তহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১০. আল ওয়ালা ওয়াল বারা [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. সালিহ্ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১১. আমাদের দাওয়াত, আমাদের আকীদা ও ফিতনাহ্ হতে মুক্তির উপায়

-শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদিয়ী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

১২. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানকীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৩. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ্ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৪. কুরআন ও সুন্নাহ্ আঁকড়ে ধরা

-সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৫. হাদীসের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আসারী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৬. এক নজরে সালাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৭. একশত কবীরা গুনাহ্

- ড. সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আস-সাইয়্যাহ [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৮. যাকাতুল ফিতর

- মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উসাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়া-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২০. নতুন চাঁদের বিধান- শায়েখ আদনান ইবনে মুহাম্মাদ আল আরঊর

[নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২১. সিয়াম পালনকারীর হিজামার বিধান

শাইখ উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ। [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২২. বিদআতের মূলনীতি ও উম্মাহর প্রতি তার কুপ্রভাব- আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু নাসির আল-ফাকীহী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]